SEPTEMBER 1987

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

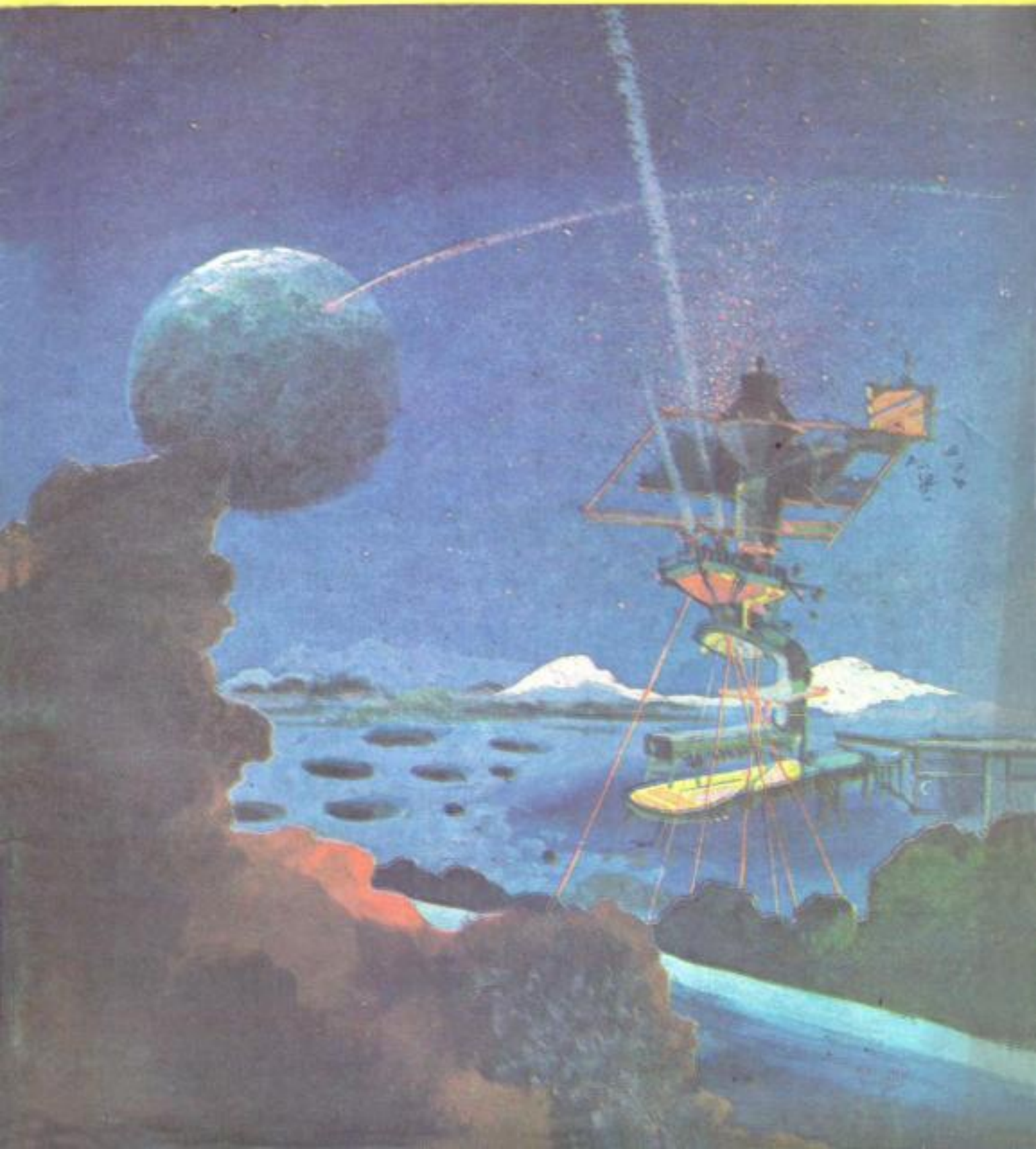

বিষয় গৌরবে অপ্রতিদ্বন্দ্বী

শারদীয়

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

অপ্রকাশিত রচনা

বিজ্ঞানী অলডাস হাক্সলি-কে লেখা জগদীশ চন্দ্রের অপ্রকাশিত পত্র

সঙ্কলন ও সম্পাদনা : দিবাকর সেন

বিজ্ঞান ভিত্তিক গল্প ও উপন্যাস

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ নারায়ণ সান্যাল ॥ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ লীলা মজুমদার ॥ ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য ॥ অদ্রীশ বর্ধন ॥ নিরঞ্জন সিংহ ॥ কিন্নর রায় সমরজিৎ কর ॥ সকর্ষণ রায়

দুটি বিজ্ঞান ও ইতিহাস নির্ভর রোমাঞ্চকর প্রবন্ধ

জয়ন্তবিষ্ণু নারলিকার ॥ শ্রীপান্থ

প্রবন্ধ : কারিগরী ও প্রযুক্তি বিদ্যা

শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ॥ এণাক্ষী চট্টোপাধ্যায় ॥ জয়ন্ত বসু ॥ সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র ॥ জগদীশচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ আবদুল্লাহ্ আলসুতী ॥ সিদ্ধার্থ রায় ॥ আশিস দাস এবং অনেকে ।

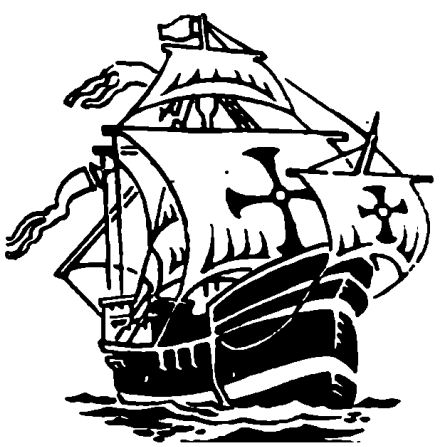

১০টি মজার এক্সপেরিমেন্টস

যা তোমরা স্কুলের ল্যাবোরেটারীতে বা ঘরে বসেই পরীক্ষা করে আনন্দ পাবে । লিখবেন :

সমীর ঘোষ ॥ অপরাজিত বসু ॥ সন্তোষকুমার মিত্র ॥ পাথসারথি চক্রবর্তী ॥ শাহজাহান তপন ॥ অমরনাথ রায় অনেকে ॥

জীবনচরিত

পাঁচজন স্বভাব বিজ্ঞানীর জীবন চরিত যা গল্পের চাইতেও রোমাঞ্চকর ॥ লিখবেন :

সুধাংশু পাত্র ॥ অরুপরতন ভট্টাচার্য ॥ অমিত চক্রবর্তী ॥ দিবাকর সেন ও কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

তিনটি নির্বাচিত প্রবন্ধ

প্রিন্সিপিয়ার দু'শ বছর ॥ জয়ন্ত বসু

সুপার নোভা ॥ রমাতোষ সরকার

বাঙালির বিজ্ঞান চর্চা ॥ অশোক দাস

পাঁচটি প্রতিযোগিতা ও অসংখ্য আকর্ষণীয় পুরস্কার

সুপার ক্যুইজ কনটেস্ট ॥ আইকিউ টেস্ট ॥ ফটো ক্যুইজ ॥ সংখ্যার খেলা ॥ অঙ্কের ধাঁধা ॥

বেরোবে মহালয়ার আগেই

৮৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

রঙিন ফিচার : পশু, পাখি, গাছপালা

অভয় হোম ॥ রতনলাল ব্রহ্মচারী এণাক্ষী বিশ্বাস ॥ তারকমোহন দাস ॥ দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

দুটি দীর্ঘ রঙিন চিত্রকাহিনী

দিলীপ দাস : খুদে বৈজ্ঞানিক

গৌতম কর্মকার : টাইটানিক

বিজ্ঞান নির্ভর অনুবাদ গল্প

সৌরেন ভট্টাচার্য ॥ ধরণী ঘোষ

ছড়া ও কবিতা

অন্নদাশঙ্কর রায় ॥ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ॥ কৃষ্ণধর ॥ অমিতাভ চৌধুরী ॥ দক্ষিণারঞ্জন বসু ॥ আনন্দ বাগচি ও আরও অনেকে

নিজে নিজে কর

সার্কিট, ডায়াগ্রাম ও বিশদ ব্যাখ্যা সহ বেশ কয়েকটি মডেল উপহার দেবেন

বিপ্লব ব্যানার্জী ॥ সৌম্য মিত্র ॥ দিলীপ পাঠক ও আরও অনেকে

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সপ্তম বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর 1987

অক্টো-নভেঃ
যুগ্ম-সংখ্যা রূপে
প্রকাশিত হবে

আগামী সংখ্যার
বিশেষ রচনা

তারক মোহন দাসের
ভারতের অরণ্য সম্পদ

প্রধান সম্পাদক : সমরজিৎ কর
সম্পাদক : রবীন বল
সহসম্পাদক : জয়ন্ত দত্ত

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 4 : **কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর** : ইঁদুর ॥ সমরজিৎ কর 7
বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প : নিউটনের বাগান ॥ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 47 এল. ভি 707 ॥ নির্মাল্যবরণ হাজরা 31

বিশেষ রচনা : সূর্য—অফুরন্ত শক্তির উৎস ॥ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র 19

পড়াশোনা : ইলেকট্রোলিসিস ও ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ॥ অমরনাথ রায় 18 পাই ॥ সুমন ঘোষ 15

জ্ঞান-বিজ্ঞানের রচনা : রেডার ॥ পৃথ্বীশ মুখার্জী ও প্রমিত ঘোষ 61 কম্পিউটার ॥ শুভাশিস আতর্থী 30 : **জ্ঞান বিজ্ঞানের বই** 51 : বিজ্ঞানের খবর ॥ অমিত চক্রবর্তী 66

পরিবেশ ও আমরা : ইন্দ্রধনুর কথা ॥ বোধিসত্ত্ব শীল 52

বিশ্বের জীবজন্তু : সামুদ্রিক কচ্ছপ ॥ ধীরেন দত্ত 22

শরীর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা : রঙীন চশমা থেকে সাবধান ॥ আশিস দাস 53 মৌলভি তামিজ খান ॥ দিবাকর সেন 54

ছবিতে গল্প ও রঙীন ফিচার : বুদ্ধিশুদ্ধি ॥ সমীর মণ্ডল 11, 14 আবিষ্কারক কলম্বাস ॥ গৌতম কর্মকার 12 : বটগাছ, খুদে বোলতা ও পাখি ॥ রতনলাল ব্রহ্মচারী ও সুমন মিদ্যা 55 : খুদে বৈজ্ঞানিক ॥ দিলীপ দাস 23 ব্ল্যাক ডায়মণ্ডস ॥ গৌতম কর্মকার 43

ব্রহ্মাণ্ডের খবর : মহাকাশের আর এক বিস্ময়—উল্কা ॥ মৃন্ময়ী দাস 27 ব্রহ্মাণ্ডের শেষ কোথায় ॥ শঙ্কর ঘটক 28

পৃথিবী ও সম্পদ : আমাদের খনিজ সম্পদ ॥ দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 39

ধারাবাহিক রচনা : নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 35 : বিজ্ঞানের ডাইরী ॥ বিমান বসু 9

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ : পরিষদের খবর 59 : সফল উত্তরদাতাদের নাম 59 : অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার 60 : ফ্লাড বেল ॥ ভাস্কর চ্যাটার্জী 60 শব্দকুট ॥ সঞ্জীব কুমার মান্না 58 : ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড 1 2 3 : 57 যাবতীয় সমাধান 58 : বলতে পারো কেন ? ॥ সুধাংশু পাত্র 65 : প্রতিযোগিতামূলক রচনা : পাখি ॥ মল্লিকা ধর 62 : চন্দন কুমার মিশ্র 62

পুজো সংখ্যায় পাঁচটি প্রতিযোগিতা ও অসংখ্য পুরস্কার

প্রচ্ছদ : সমীর মণ্ডল : অন্যান্য ছবি : অলয় ঘোষাল ও সুবোধ মণ্ডল

চিঠিপত্র

আমেরিকার প্রকৃত আবিষ্কারক

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা বিভাগে ডাঃ অরুণ কুমার দত্ত মহাশয় তাঁর 'বৃটিশ নৌশক্তির শ্রেষ্ঠত্বের রহস্য'-এ লিখেছেন : 'কলম্বাস সেই সোনার ভারত খুঁজতে গিয়ে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করেছিলেন।' [কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান, এপ্রিল 1986, পৃষ্ঠা-13]

আমরা ছাত্রাবস্থা থেকে জেনে এসেছি এবং নানা পত্র-পত্রিকা তথা পাঠ্য ও অন্যান্য বইয়ে পড়েছি যে ক্রীস্টফার কলম্বাস (Coristopher Columbus) আমেরিকা আবিষ্কার করেন 1492 সালে এবং আমেরিগো ভেস্‌পুচি নামক একজন বিশেষজ্ঞের নামে 'আমেরিকা' নামকরণ করা হয়।

কিন্তু গত 28 মে, 1983 তারিখে 'দ্য টেলিগ্রাফ' (The Telegraph, 28 May, 1983) দৈনিক ইংরেজি পত্রিকায় প্রকাশিত এস্‌. এল্‌. মেনেজেস (S. L. Meneges) লিখিত 'Who discovered America first ?' শীর্ষক সুদীর্ঘ ও তথ্যপূর্ণ লেখাটি পড়ে, সেই ধারণা বা বিশ্বাস পালটে গেল।

'দ্য টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় বলা হয়েছে, Time magazine এর ডিসেম্বর 13, 1982 সংখ্যায় একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়—"প্রায় সকলেই মনে করেন যে ক্রীস্টফার কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন।" ["Almost everyone thinks that Christopher Columbus discovered America."] প্রশ্ন হল, তিনিই কি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ?

ঘটনাটি তখনই ঘটলো, যখন স্পেইন, আমেরিকা সহ অন্যান্য 34 (চৌত্রিশ) টি দেশ আগামী 1992 সালে কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পাঁচশত বছর পূর্তি পালনের জন্য প্রস্তাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়। ঠিক কয়েক মিনিটের মধ্যেই আয়ারল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত বাধা দিলেন : "সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে সেণ্ট ব্রেনডান নামক এক আইরিশ পাদ্রী আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করেন।" ["The Irish monk St Brendan may have made the Crossing of the Atlantic before the Seventh Century."] কিন্তু ঐ দাবিও পরমুহূর্তে অ্যাইসল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত বাতিল করেন : "লেইফ এরিক্‌সন নামক নরওয়ে বংশোদ্ভূত আইসল্যাণ্ড বাসী 1000 খ্রীস্টাব্দে আমেরিকার উপকূলে পৌঁছান।" ["The honour belongs to Leif Ericson, one Icelander of Norwegian descent, who landed on American Shores in the year 1000...."]

এই ধরনের দাবি-পালটাদাবির মধ্যে প্রস্তাবটি সাময়িক ভাবে স্থগিত

পদার্থ বিজ্ঞানের এককাবলী

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে'র জুন '87 সংখ্যায় 'পড়াশুনো' বিভাগে রমানাথ চক্রবর্তীর আগামী মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য 'এককাবলী' তৈরির একক প্রচেষ্টায় আন্তরিকতা থাকলেও তথ্যে বেশকিছু ভুল রয়েছে। কিছুটা মুদ্রণ ত্রুটি বাদ দিলে বাকী দোষটুকু লেখককে না দিয়ে উপায় নেই। যেমন—

(ক) 'মৌলিক একক' এর স্থলে হবে 'মৌলিক রাশি'। দৈর্ঘ্যের একক লিখতে গিয়ে লেখক 'মিটার'কে বাদ দিয়েছেন। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছেন ভরের একক লিখতে গিয়ে। M.K.S. পদ্ধতি C.G.S. পদ্ধতির কাছে ঋণী ঠিকই, কিন্তু তা বলে একে উপেক্ষা করা কি উচিত ?

আয়তনের এককের আলোচনায় লেখক লিখেছেন 1 গ্যালন = 0·61 ঘনফুট অথচ হবে 0·16 ঘনফুট উল্টোটাতেও গলদ ; লিখেছেন 1 ঘন-ফুট = 0·25 গ্যালন হবে 6·25 গ্যালন।

ত্বরণের এককে লেখকের ইংরেজী প্রীতি মোটেই প্রশংসনীয় নয়। সেমি./sec^2 এর স্থলে তাঁর লেখা উচিত ছিল সে.মি./সেকেণ্ড^2 অথবা cm/sec^2।

বলের এককের সম্পর্কে লিখতে গিয়ে 1 পাউণ্ডাল = 13825 ডাইন এর স্থলে 13825·7 ডাইন লিখলে তথ্য আরো নির্ভুল হতো।

ক্ষমতার এককের পারস্পরিক সম্পর্কে লেখক বলেছেন 1 H.P. = 764 watt কিন্তু হবে 746 watt (যদিও এটা খুব সম্ভবতঃ মুদ্রণ ত্রুটি)

লেখকের বক্তব্য, 1 আলোকবর্ষ = $5·65 \times 10^{1}$ মাইল = $9·45 \times 10^{12}$ কিমি।

দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রকৃত পক্ষে, 1 আলোকবর্ষ = $5·878 \times 10^{12}$ মাইল = $9·46 \times 10^{12}$ কি মি.

রাখা হয়। সম্ভবত আমেরিকান ভারতীয়রা প্রমাণ করতে পারেন যে হরপ্পা সভ্যতার যুগে সেখানে (আমেরিকা) ভারতীয়রা প্রথম পৌঁছান।

মেনেজেসের প্রবন্ধ থেকে স্পষ্ট ধারণা হয়, কলম্বাসের শ শ বছর পূর্বেই আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়।

ক্রীষ্টফার কলম্বাসের অনেক পূর্বেই যে সেণ্ট ব্রেনডান নামক এক আইরিশ পাদ্রী, সংগী সহ আমেরিকায় পৌঁছান সে তথ্য 'আলোকপাত' (এপ্রিল 1986) নামক মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সুরেন্দ্র কুমার-এর 'চামড়ার নৌকায় আটলান্টিক পাড়ি' লেখাটিতেও পাওয়া যায়।

স্প্যানিশ ও লাতিন পুঁথিপত্রে সেণ্ট ব্রেনডান-এর অভিযান সম্পর্কে উল্লেখ পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে স্প্যানিশ সাহিত্যের গবেষিকা ডরোথি সাভারিন-এর বক্তব্য হ'ল—"ব্রেনডানের অভিযানের কাহিনী কোন কাল্পনিক নয়। কোন কাল্পনিক বর্ণনায় ভৌগোলিক বিবরণ যাত্রা পথের এমন সঠিক বিশ্লেষণ, ভয়ানক কষ্টের কথা এত নিখুঁত ভাবে উল্লেখ করা অসম্ভব। এটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থাকলে তবেই সম্ভব।"

অতএব, বিভিন্ন আলোচনা অর্থাৎ সন-তারিখের ভিত্তিতে কলম্বাসকে আমেরিকা আবিষ্কারক বলা যায় না। অবশ্য একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী হিসেবে কলম্বাসের কৃতিত্বকে ছোট করা যায় না। যদিও ইতিহাসের বিচারে তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ নন। তিনিই বিশ্বে উপনিবেশের বীজ রোপণ করে গেছেন, এবং সেই উপনিবেশবাদ এর কুফল বহু শতাব্দী ধরে মানুষ ভোগ করে আসছেন। তিনি ক্রীতদাস প্রথা সমর্থন করতেন।

মানুষের অজানাকে জানার যে অদম্য স্পৃহা এই কথাটি কলম্বাসের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

বাস্তব পক্ষে কে বা কারা আমেরিকা প্রথম আবিষ্কার করেন, তা এই মুহূর্তে সঠিক ভাবে বলা মুসকিল। সে কাজ নিরলস গবেষকদের।

তবে আনন্দের বিষয়, আমেরিকা আবিষ্কারের দাবিদারের মধ্যে 'ভারত' অর্থাৎ ভারতীয়রও নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। সে দাবি প্রতিষ্ঠিত হোক, এই আমাদের কাম্য। ইতিহাস সন-তারিখ অর্থাৎ তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

সমীর কুমার সূত্রধর, শান্তিধাম কালীবাড়ী উচ্চবিদ্যালয় নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও, 783380 আসাম।

অঙ্কের মজা

গত মার্চ সংখ্যায় সুবীর চক্রবর্তীর 'ক্যালেন্ডার নিয়ে অঙ্কের মজা' পড়লাম। এতে মজা—3 এই অঙ্কটিতে কিছু ভুল চোখে পড়ল। এখানে কর্ণ দুইটির সংখ্যাগুলির গুণফল $12 \times 20 \times 28 = 6720$ (ঠিক আছে)। $26 \times 20 \times 14 = 12480$ হবে। এখানে 20 ও 14 এর জায়গায় 10 ও 24 লেখা হয়েছে। আবার বিয়োগফলকে 21 দিয়ে ভাগ করতে বলা হয়েছে কিন্তু উদাহরণে 28 দিয়ে ভাগ করা হয়েছে সুতরাং অঙ্কটি পুরোপুরিই ভুল। এইভাবে কোন সময়ই মাঝের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে না।

দেবাশিস ধর, নিউ কলোনী, বঙাইগাঁও, আসাম।

1987 সালের মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত সুবীর চক্রবর্তীর 'ক্যালেন্ডার নিয়ে অঙ্কের মজা' প্রবন্ধে মজা 3 এর মধ্যে সত্যিই মজা নয় কি? কারণ, প্রবন্ধে প্রকাশ, বিয়োগফলকে 21 দিয়ে ভাগ করলে মাঝের সংখ্যাটি পাওয়া যাবে। কিন্তু উদাহরণে দেখা যাচ্ছে 28 দিয়ে ভাগ করে উত্তর বের করা হয়েছে এটা কি সঠিক না ভুল?

দেবাংশু মণ্ডল, সুন্দরবন।

16 পৃষ্ঠার শেষ দিকে লেখক কেলভিন স্কেলের এক চমকপ্রদ সংজ্ঞা দিয়েছেন। তার মতে, 'যে উষ্ণতায় গ্যাসের আয়তন '0' হয় তাহাই পরম উষ্ণতা $V - 273 = V_0\left(1 - \frac{273}{273}\right) = 0$ ইহাই কেলভিন স্কেল।' অ্যাভোগাড্রো সংখ্যাকে লিখেছেন $6{\cdot}023 \div 10^{23}$ অথচ মিলিকান কষ্ট করে বের করেছিলেন $6{\cdot}023 \times 10^{23}$।

'বিদ্যুৎ' প্রসঙ্গে এক জায়গায় লিখেছেন $V \propto IR$; হবে $V = IR$। জুলের সূত্রে তিনটির ত্রিবেণী সঙ্গমে $K = 0{\cdot}24$ লিখতে গিয়ে লেখক $R = 0{\cdot}24$ লিখে ফেলেছেন। ইলেকট্রনের ভর $= 9{\cdot}1083 \times 10^{-27}$ গ্রাম এবং নিউট্রনের ভর $= 1{\cdot}6748 \times 10^{-24}$ গ্রাম—এ দুটোর তথ্যও লেখক ভুল পরিবেশন করেছেন।

এ সমস্ত আপাত ত্রুটি বিচ্যুতির আড়ালে লেখকের প্রচেষ্টা যে যথেষ্ট প্রশংসনীয় তা বলতেই হবে। **প্রবীর কুমার মিশ্র**, কাড়োলা, উত্তর 24-পরগনা।

এ সম্পর্কে আরও চিঠি লিখেছেন:

হিরণ্ময় নায়ক বাঁকুড়া, নিশীথ রায় বর্দ্ধমান, জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার 24-পরগনা, সুমন্ত ব্যানার্জী হুগলী, সৌরভ ভদ্র হাওড়া, সুদীপ রায় হাওড়া, প্রভাত কোটাল হাওড়া।

পত্রিকা বিনিময়ে আগ্রহী

কোনো পাঠক পাঠিকা যদি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান এর বিনিময়ে বাংলাদেশের কোন পত্র-পত্রিকা পেতে ইচ্ছুক থাকেন তবে সেই পত্রিকার নাম ও আপনার ঠিকানা সহ নিম্ন ঠিকানায় পত্র দিয়ে জানাবেন।

আরিফুর রহমান, C/o মোঃ আশ্রাফ উদ্দিন, 73, কে. পি. ঘোষ ষ্ট্রীট, ঢাকা-1100, বাংলাদেশ।

এখন পছন্দ আপনার। পুরীর
সফেন নীল সমুদ্র অথবা রাঁচীর
নির্জন প্রকৃতি। দু জায়গাতেই
আপনি পাবেন দক্ষিণ পূর্ব
রেলওয়ের হোটেল। উষ্ণ মনোরম
আতিথেয়তা আর চমৎকার
তৃপ্তিকর খাবার। ঠিক যেমন
আমেজ আপনি চান।
বিস্তারিত বিবরণের জন্য
যোগাযোগ করুন:

ম্যানেজার,
দঃ পূ রেলওয়ে হোটেল,
পুরী, ফোন ৬৩ গ্রাম : সার্ফ

ম্যানেজার
দ:পূ রেলওয়ে হোটেল,
রাঁচী, ফোন ২১৯৪৫ গ্রাম: রেস্টফুল

সহকারী কমার্শিয়াল অফিসার (রিজার্ভেশন)
৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট কলকাতা-৭০০০০১
ফোন ২৩৯৪৯৪ ২৩০৫১৯ ২৩০২৫৭

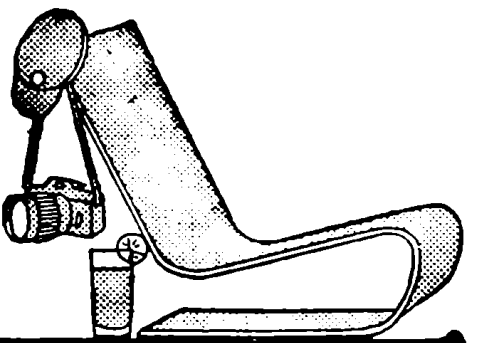

খোশ মেজাজে ছুটির

আরাম

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের হোটেল-পুরী ও রাঁচী

CONTAD/SERH/10 85

ইঁদুর

সমরজিৎ কর

আকারে ছোট হলে কি হবে, পৃথিবীর সব দেশেই ইঁদুর একটি বড় রকম সমস্যা। দেখলে মনে হবে, আহা, কী নিরীহ। কিন্তু বজ্জাতি? তার কোন তুলনাই হয় না। পরীক্ষা সামনে। খুব মন দিয়ে পড়াশুনা করছ। হঠাৎ মনে হল, ছোট্ট একটি ছায়া মেঝের উপর ছোটাছুটি করছে। সে দিকে চাইতেই—সর্বনাশ! একটি নেংটি ইঁদুর। চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে ছুটে গেলে ধরতে। ব্যাস। হাওয়া। তাকের উপর তোমার বইপত্রের আড়ালে নিমেষে অদৃশ্য। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও আর পাবে না। বরং হয়ত দেখবে তাকে পাকড়াতে গিয়ে যে বইটি তাক থেকে টেনে বের করলে, তার মলাট দুটিই আছে, মলাটের মধ্যেকার পাতাগুলি কুচিকুচি অবস্থায় জমে রয়েছে। মানে, তোমার নিজেরই সর্বনাশ।

সত্যি কথা বলতে কি, বছর ষাট আগে ইঁদুর সম্পর্কে কড়া মন্তব্য করেছিলেন দুজন ইংরেজ প্রাণিবিজ্ঞানী—জি. ই. এইচ ব্যারেট-হ্যামিলটন এবং এম. এ. সি হিলটন। তাঁদের মন্তব্যটা ছিল এই রকম: ইঁদুর অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রাণী। বিশেষ করে মানুষের ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে বলার মত তার একটিও গুণ নেই।

পৃথিবীতে নানা প্রজাতির ইঁদুর দেখা যায়। ব্যারেট-হ্যামিলটন এবং হিলটন যাদের সম্পর্কে এই মন্তব্যটি করেন, বিজ্ঞানীদের ভাষায় তাদের বলা হয় র‍্যাটাস নরভেগিকাস (Rattus norvegicus)। শীত এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল যেখানেই বাস সেখানেই দেখতে পাবে এই ইঁদুর। এদের দেহটি হয় একটু বড়সড়। চেহারায় ভারিক্কিভাব। কান দুটি হয় ছোট। লেজ অপেক্ষাকৃত ছোট এবং মোটা। খাবারদাবার ভাল পেলে এই জাতের একটি ইঁদুরের ওজন পাঁচশ' গ্রামও হতে পারে।

আর এক ধরনের ইঁদুর পৃথিবীর সব দেশেই প্রায় দেখা যায়। এদের বলা হয় র‍্যাটাস র‍্যাটাস (Rattus rattus)। এদের গঠন অনেকটা নরম। কান অপেক্ষাকৃত বড় এবং লম্বা। ওজন দুশ' থেকে তিনশ' গ্রাম। মজার ব্যাপার এই, দু জাতের ইঁদুরই কিন্তু মানুষের উপর খুবই নির্ভরশীল। আবহাওয়া গরম হলে র‍্যাটাসরা আনন্দিত হয়। নরভেগিকাসের কাছে ঠাণ্ডাই পছন্দ। অনেক সময় উভয় প্রজাতির ইঁদুরই একই বাড়িতে বাস করে। তবে বাসস্থান হিসেবে র‍্যাটাস বাড়ির ছাদ, মাচা, অথবা ওই

র‍্যাটাস নরভেগিকাস

ধরনের কোন একটি জায়গা বেছে নেয়। নরভেগিকাস বাস করে মেঝের নিচে কোন গর্তে। অনেক সময় বাড়ির আশপাশের জমিতেও গর্ত করে। গৃহস্থের বাগানে কোন কোন গাছের ফোকর হলেও আপত্তি নেই। কেন তারা জনবসতিতে বাস করে সেটাও একটা বড় প্রশ্ন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এর কারণ হয়ত দুটি। এক, মানুষের ঘরবাড়ি বা তার বাগানের জমি বাস করার পক্ষে অনেকটা নিরাপদ। অন্যান্য জন্তু জানোয়ারের ভয় নেই। ঘরবাড়ি বা তার আশপাশে গর্তখন্দ তো থাকেই। তা ছাড়া ছাদের ফোকর, আসবাব পত্রের আড়াল—সে সব জায়গায় তোফা বাস করা যায়। নেহাৎ কারোর মুখোমুখি না হলে, বিপদ নেই। দুই, খাবারের দিক থেকেও নিশ্চিন্ত। গৃহস্থের ধানগমের গোলা আছে. বাগানের গাছে সারা

র‍্যাটাস র‍্যাটাস

বছর ধরেই তো ধরে কত রকম ফল, তাছাড়া গৃহস্থের রান্নাঘরের খাবার, আস্তাকুড়ে ফেলে দেওয়া খাবার—কোথায় অভাব ? এর জন্যেই তারা বাস করে মানুষের সমাজে।

অনেকের ধারণা নরভেগিকাস দেহের দিক থেকে র‍্যাটাসের চেয়ে বড়, শক্ত সমর্থ। অতএব তারা মুখোমুখি হলেই বুঝি মারামারি করবে। তবে এ সম্পর্কে নানা জনের নানা মত। ইঁদুর সাধারণত নিশাচর। এদের চলাফেরা কাজকর্ম সব রাতের দিকে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় এদের আচরণ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া শক্ত হয়। তবে কৃত্রিম উপায়ে দিনের দিকেই রাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে ইঁদুর নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন বিজ্ঞানীরা।

যেমন ধরো, এস. এ. বারনেট নামে এক জীববিজ্ঞানী দুটি খাঁচা নিলেন। খাঁচা দুটির একটিতে রাখলেন কয়েকটি নরভেগিকাস এবং অপরটিতে রাখলেন কয়েকটি র‍্যাটাস। ইঁদুর শুদ্ধ খাঁচা দুটি এবার একটি ঘরের মেঝেতে এনে বসিয়ে রাখলেন। খাঁচা দুটির মধ্যে রইলো কিছুটা ফাঁকা জায়গা। তাদের দরজাদুটিও রইলো মুখোমুখি। বারনেট খাঁচা দুটির মধ্যেকার ফাঁকা মেঝেতে কয়েক টুকরো রুটি রেখে দিয়ে তাদের দরজা দিলেন খুলে। তারপর ঘরের জানলা দরজা বন্ধ করলেন। ঘর অন্ধকার হল। এবার টিমটিমে একটি বাল্ব জ্বালিয়ে (ঘরের এক কোণে) তিনি কিছুটা দূরে গিয়ে নিশ্চুপ বসে রইলেন।

এক মিনিট গেল। দু মিনিট।—আর তারপর র‍্যাটাসের খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল একটি র‍্যাটাস। এসেই থাবা বাড়াল এক টুকরো রুটির ওপর। পরক্ষণেই অপর খাঁচার দরজা দিয়ে, তড়াক করে লাফিয়ে এল একটি নরভেগিকাস। এসেই ঝাঁপিয়ে পড়ল র‍্যাটাসের উপর। শুরু হল দুজনে মারামারি। পরমুহূর্তে দুটি খাঁচারই ইঁদুর বেরিয়ে এসে পরস্পরের মধ্যে শুরু করে দিল লড়াই। নরভেগিকাসগুলির গায়ের জোরের কাছে দেখতে দেখতে কাবু হয়ে পড়ল র‍্যাটাসের দল। দু একটি মারা গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। যারা বেঁচে রইলো, তারাও দুই এক দিনের মধ্যেই মারা গেল। অদ্ভুত একটি ব্যাপার লক্ষ করলেন বারনেট। যে সব র‍্যাটাস শেষের দিকে মারা গেল, তাদের গায়ে কামড়ের কোন চিহ্নই নেই। এ থেকে তাঁর ধারণা হয়, র‍্যাটাসগুলি নরভেগিকাসের আক্রমণে ভয় পেয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ অতিরিক্ত ভয় পাওয়ায় তাদের স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে। শরীরের স্বাভাবিক কাজ কর্ম বিঘ্নিত হয়। তাদের হৃদপিণ্ড হয়ে ওঠে দুর্বল, এর ফলেই তারা মারা গিয়েছিল।

এটা একটি দিক। অন্য ব্যাপারও দেখা যায়। যেমন ধরো, একটি খাঁচায় যদি অনেকগুলি বাচ্চা ইঁদুর রাখ, তারা নিজেদের মধ্যে মারামারি করবে না। তাদের মধ্যে ছেলেমেয়ে দুই থাক। ভয় নেই, কিন্তু ধারী ইঁদুর রাখলেই গোলমাল। যদি একই সঙ্গে পুরুষ এবং স্ত্রী ইঁদুর রাখ, দেখবে পুরুষরা নিজেদের মধ্যে মারামারি শুরু করেছে। মানে রক্তারক্তি ব্যাপার। একজন আর এক জনকে শেষ না করে ছাড়বে না।

হয়ত প্রশ্ন করবে, এক জাতের ইঁদুর যদি অন্য জাতের ইঁদুরের সঙ্গে রাখা যায় ?

এ ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দাঁড়াবে এই : ভিন জাতের ইঁদুরটি যদি বাচ্চা হয়, তার দিকে কেউ তেমন একটা নজরই দেবে না। ব্যাপারটা যেন, আমাদের দলে যখন এসে পড়েছ, থাকো। বয়স্ক স্ত্রী ইঁদুর হলেও তেমন ঝামেলা হয় না। কিন্তু বয়স্ক পুরুষ ইঁদুর হলেই বিপদ। দলের ধারী পুরুষরা তখন ভিনজাতের ধারীর উপর হামলা চালাবে। এবং শেষ পর্যন্ত হত্যা করবে।

আরো কত রকম ঘটনাই না দেখা যায়। বংশ বাড়তে বাড়তে হয়ত সংখ্যায় তারা বেড়ে গেল অনেক। ওই সময় দেখা যায় ইঁদুরের বাচ্চা হতে থাকে কম, হঠাৎ দেখা গেল খাবারে টান পড়েছে। প্রচুর ইঁদুর অথচ খাবার কম। তখন অবস্থাটা দাঁড়ায় ভয়ঙ্কর। ওদের রাগ বেড়ে যায়। নিজেদের মধ্যে শুরু হয় মারামারি খুনোখুনি। মারাও পড়ে অনেকে। আবার উদ্যোগীও খুব। সমস্যা এলেই যে হাত পা গুটিয়ে থাকবে, তাও নয়। খাবার সন্ধানে তারা ওস্তাদ। খুঁজে পেতে খাবার তারা বের করবেই। সে গোলার ধানই হোক, অথবা খেতের ফসল, নিদেন পক্ষে তোমাদের পড়ার বইগুলি তো আছেই। থাকার জায়গা—মানে যেখানে বেশ আরামে এবং নিরাপদে থাকা যায়। তেমন জায়গা দখল করার ব্যাপারেও তাদের মধ্যে বেশ মনোসিরানা দেখা যায়।

তবু, ওই যে, ইঁদুর মানুষের বড় শত্রু। প্রতি বছর শুধু আমাদের দেশেই হাজার হাজার টন খাদ্যশস্য ইঁদুরের পেটে যায়। ইঁদুর কখনো কখনো রোগও ছড়ায়। যেমন প্লেগ। তাই ইঁদুর ধ্বংসের জন্যে নানা রকম ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে সব সময় আমরা যে সফল হই, তাও বলব না।

বাংলা দেশে
কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার গ্রাহক হবার ঠিকানা
সম্পাদক : বিজ্ঞানবার্তা
পোঃ বক্স : 553 চট্টগ্রাম—ফোন 207987

বিজ্ঞানের ডায়েরী—সেপ্টেম্বর বিমান বসু

2 সেপ্টেম্বর 1853, এই দিন বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ ফ্রেডরিক উইলহেল্ম্ অস্টওয়াল্ড (Friedrick Wilhelm Ostwald) বর্তমান সোভিয়েত রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত রিগা (Riga) শহরে জন্ম গ্রহণ করেন।

তিনিই সর্বপ্রথম রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অনুঘটক (catalyst)'এর প্রয়োগ নিয়ে গবেষণা চালান এবং অনুঘটক ব্যবহার করে অ্যামোনিয়া গ্যাসকে নাইট্রিক অক্সাইড ও নাইট্রিক অ্যাসিডে পরিবর্তিত করার পদ্ধতি বের করেন। এর ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় বিস্ফোটক তৈরির জন্য জার্মানিকে বিদেশ থেকে আর নাইট্রেট লবণ আমদানি করতে হয়নি। অনুঘটক নিয়ে গবেষণার জন্য অস্টওয়াল্ডকে 1909 সালে রসায়নের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

3 সেপ্টেম্বর 1976, এই দিন দ্বিতীয় ভাইকিং গ্রহযান (Viking-2) মঙ্গল গ্রহের ওপর প্রথম ভাইকিং গ্রহযান থেকে প্রায় 7400 কিলোমিটার দূরে উত্তর-পূর্বে অবতরণ করে। এতেও প্রথম গ্রহযানটির মত ক্যামেরা ও মঙ্গলগ্রহের মাটি তুলে পরীক্ষা চালানোর জন্য আবশ্যক যন্ত্রপাতি ছিল।

4 সেপ্টেম্বর 1982, এপ্রিল মাসে উৎক্ষেপণের পর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে নানা যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেওয়ার পর ভারতের প্রথম বহুউদ্দেশীয় উপগ্রহ 'ইনস্যাট-1' (INSAT-1A ' কে এই দিন মহাকাশে পরিত্যাগ করা হয়।

9 সেপ্টেম্বর 1737, ইতালীয় শারীরতত্ত্ববিদ ও বোলোগনা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ে শারীরবিদ্যার অধ্যাপক লুইগি গ্যালভানি (Luigi Galvani) এই দিন বোলোনাতে জন্মগ্রহণ করেন। 1768 সালে ব্যাঙের পা নিয়ে পরীক্ষা চালাতে গিয়ে তিনি দেখতে পান যে বিভিন্ন দুটি ধাতুর পাতকে যদি সদ্যমৃত ব্যাঙের পায়ের মাংসপেশীর সংস্পর্শে আনা হয় তাহলে ঐ পেশী সজোরে সংকুচিত হয়। ঠিক যেমনটি জোরালো বৈদ্যুতিক সংঘাতের (shock) ফলে দেখা যায়। সে সময় অবশ্য কেবল মাত্র স্থির বিদ্যুৎ নিয়েই বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতেন, কারণ বৈদ্যুতিক ব্যাটারি বা জেনারেটর

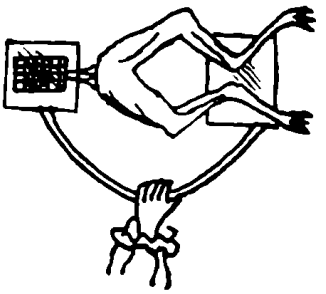

তখনও আবিষ্কৃত হয় নি। যদিও গ্যালভানি সেদিন ঐ ঘটনার সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারেন নি, তাঁর ঐ পরীক্ষা প্রমাণ করে দেয় যে দুটি বিভিন্ন ধাতুর পাতকে লবণাক্ত দ্রবণের সংস্পর্শে রাখা হয় তাহলে তাদের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হয়। ঐ পরীক্ষার ভিত্তিতেই 1800 সালে ইতালীয় পদার্থবিদ আলেসান্দ্রো ভোল্টা (Alessandro Volta) সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক ব্যাটারি তৈরি করেন।

9 সেপ্টেম্বর 1896, এই দিন জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট (Frankfurt) শহরে হৃৎপিণ্ডের ওপর প্রথম সফল অস্ত্রোপচার (cardiac surgery) সম্পন্ন হয়। ঐ অস্ত্রোপচার চালানো হয় লুই রেন (Louis Rehn) নামক এক যুবকের ছুরিকাহত হৃৎপিণ্ডকে সারানোর জন্য।

14 সেপ্টেম্বর 1894, খ্যাতনামা রসায়নবিদ ও খড়্গপুরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি'র প্রাক্তন ডিরেক্টর জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এই দিন পশ্চিমবঙ্গের

পুরুলিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়ন শাস্ত্রের তিনটি বিষয় নিয়ে তিনি উল্লেখনীয় গবেষণা

চালিয়েছিলেন। প্রথমটি ছিল কোনও লবণের দ্রবণ বা ইলেকট্রোলাইট (electrolyte) এর বিদ্যুৎ পরিবাহিতার সঙ্গে ঐ লবণের পরিমাণের সম্পর্ক নির্ণয়ের এক গাণিতিক সূত্র প্রণয়ন। তাঁর গবেষণার দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল অনুঘটকের সাহায্যে ওয়াটার গ্যাস থেকে ফিসারট্রপস্ (Fisher Tropsch) পদ্ধতিতে তরল জ্বালানী উৎপাদন। তিনিই প্রথম এদেশে ফিসারট্রপস্ পদ্ধতিতে কয়লা থেকে পেট্রল উৎপাদন নিয়ে গবেষণা চালান। এছাড়া জ্ঞানচন্দ্র আলোক রসায়ন (Photo chemistry) নিয়েও গবেষণা চালিয়েছিলেন। 1954 সালে কিছুদিনের জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদে ছিলেন। 1955 সাল থেকে 1959 সালে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত জ্ঞানচন্দ্র ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য ছিলেন।

15 **সেপ্টেম্বর** 1959, এই দিন ভারতে প্রথম টেলিভিশন প্রসারণ শুরু হয়। প্রথমে দিল্লীর আকাশবাণী ভবনের ছাদে লাগানো কম শক্তির এক ট্রান্সমিটার থেকে নিয়মিত ভাবে প্রতিদিন এক ঘণ্টার অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

15 **সেপ্টেম্বর** 1977, এই দিন কলকাতার সল্ট লেকে ভারতের প্রথম ভেরিয়েবল্ এনার্জি সাইক্লোট্রন (Variable Energy Cyclotron) চালু করা হয়। যন্ত্রটির প্রথম সফল পরীক্ষণ অবশ্য এর তিন মাস আগে, 16 জুন তারিখে সম্পন্ন হয়েছিল। সে দিন ঐ যন্ত্রে ত্বরিৎ আলফা কণা দিয়ে আঘাতের ফলে তামার অণু থেকে তেজস্ক্রিয় গ্যালিয়াম-68 অণুর সৃষ্টি হয়েছিল। 224 সেণ্টিমিটার ব্যাসের সাইক্লোট্রনটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় ন' কোটি টাকা।

18 **সেপ্টেম্বর** 1819, এই দিন ফরাসী বিজ্ঞানী ফুকো (Jean Bernard Leon Foucault) প্যারিসে জন্মগ্রহণ করেন। ফুকোই 1850 সালে সর্বপ্রথম দোলক (pendulum) ব্যবহার করে পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণনের গতি প্রমাণ করে দেন। প্যারিসে একটি প্রাচীন ভবনের উঁচু গম্বুজের তলা থেকে প্রায় মেঝে পর্যন্ত লম্বা ইস্পাতের তারের এক প্রান্তে একটি ভারি ধাতুর গোলক জুড়ে তিনি ঐ বিশেষ দোলকটি (Foucault's pendulum) তৈরি করেন। ঐ দোলকটিকে দুলিয়ে দিলে ভারি গোলকের নিচে লাগানো একটি পিন মাটিতে ছড়ানো বালির ওপর আঁক কেটে যায়। ঐ আঁকের দিক পরিবর্তন থেকেই পৃথিবীর দৈনিক ঘূর্ণনের

প্রমাণ পাওয়া যায়। ফুকোর আর একটি কৃতিত্ব গবেষণাগারের ভেতরেই আলোর গতিবেগ নির্ধারণের এক অভিনব পদ্ধতির আবিষ্কার। দ্রুতবেগে ঘূর্ণায়মান একটি আয়না ব্যবহার করে 1850 সালে আলোর সঠিক গতিবেগ নির্ণয় করেন। ফুকোর আর একটি অবদান জাইরোস্কোপ (gyroscope) যন্ত্র, যা আধুনিক কালে জাহাজ ও বিমানের গতির লক্ষ্য স্থির রাখতে সহায়তা করে।

25 **সেপ্টেম্বর** 1960, বিশ্বের প্রথম পরমাণু শক্তিচালিত বিমানবাহী যুদ্ধপোত 'এণ্টারপ্রাইজ' (USS Enterprise)কে এই দিন জলে নামানো হয়।

28 সেপ্টেম্বর 1895, এই দিন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল 73 বছর।

পুরুষ সামুদ্রিক ঘোড়ার বাচ্চা

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

সামুদ্রিক ঘোড়া (Sea horse) এক আশ্চর্য প্রাণী মাথাটা অনেকটা ঘোড়ারমত দেখতে তাই এমন নাম। আসলে এটি মাছ। পঞ্চাশের বেশি রকমের সামুদ্রিক ঘোড়া দেখতে পাওয়া যায় আর সাইজ নানা রকমের হয় 5 সেমি. থেকে 25 সেমি. পর্যন্ত। খাদ্য সামুদ্রিক পোকা মাকড়, অন্য মাছের ডিম। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করা গেছে মরা জিনিস এরা খায় না।

সামুদ্রিক ঘোড়ার কথা বুদ্ধিশুদ্ধির পাতায় আসাটা বোধ হয় ঠিক নয়। আসলে হয় কি জানো ? মজার সব ব্যাপার স্যাপার তোমাদের জন্য যোগাড় করতে গিয়ে এ ধরনের বিষয়ও আমার কাছে খুব মজার মনে হয়। তাই তোমাদের জানাবার লোভ সামলাতে পারি না। যাই হোক মজার ঘটনাটা বলি।

অনেকে শখ করে মাছ পোষার পাত্রে সামুদ্রিক ঘোড়া পোষে। তারা লক্ষ্য করেছে পুরুষ মাছের পেটের নিচে একটা পাতলা থলি থাকে। সেই থলি ফেটে বাচ্চার জন্ম হতেও তারা স্বচক্ষে দেখেছে। আসলে মাছ বিশারদ বিজ্ঞানীদের মতটা একেবারে অন্য। মেয়েরাই ডিম পাড়ে। সেই ডিম পাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষরা তাদের থলিতে তা ধারণ করে। ঐ 40 থেকে 50 দিন থাকার পর ডিম ফুটে বাচ্চা বার হয় এবং পুরুষেরপেটের নিচের ঐ থলি থেকে শেষ পর্যন্ত বাচ্চারা বেরোয়। তাই মাছ যারা পোষে তারা ঠিকই দেখেছে।

বুদ্ধিশুদ্ধি : 'খাম খুলবে সাবধানে'র উত্তর

তোমাকে খুলতে হবে 15 লেখা খামটা। আগেই বলে দেওয়া হয়েছে ওপরের লেখার সঙ্গে ভিতরের টাকার মিল নেই। অতএব 15 লেখা খামের মধ্যে 15 টাকা নেই। তাই যদি হয় ভিতরের একটি খাম খুলে তুমি যদি পাও পাঁচ টাকার নোট তাহলে অন্যটিতেও পাঁচ টাকার নোটই থাকবে। আর যদি দশ টাকার নোট পাও ত অন্যটিতে দশ টাকার নোটই থাকবে। এক জোড়ার টাকাটা যখন তোমরা জানা হয়েই গেল তখন বাকী রইল কী ?

KJB/Sept/3/87

আবিষ্কারক কলম্বাস

বাণীরূপ : অমিল কর্মকার চিত্রায়ণ : গৌতম কর্মকার

ভাইয়ের কুটীরে আবির্ভাব হলেন কলম্বাস। কাছেই বাস করেন বার্থালোমিউ পেরেস্ত্রেলো, প্রিন্স হেনরীর অধীনস্থ একজন ক্যাপ্টেন। পোর্টো সান্টো দ্বীপের প্রথম রাজ্যপাল। বিরাট ধনী। সাগরে সাগরে জলযাত্রায় কতো দীর্ঘ তাঁর অভিজ্ঞতা। কলম্বাস তাঁর সঙ্গে পরিচিত হলেন। অজানা আটলান্টিকের কতো গোপন রহস্য দিনে দিনে মেলে ধরলেন পেরেস্ত্রেলো। প্রিন্স হেনরীর নির্দেশে কতো গবেষণার বিচিত্র ফলাফল। কলম্বাস মুগ্ধ। আশায় আনন্দে নেচে উঠলো তাঁর বুক। খানিক দূরেই ফেলিপা—ফেলিপা মোঞিস, পেরেস্ত্রেলোর তরুণী রূপসী কন্যা। কলম্বাসের স্বপ্ন তাঁর মনে দোলা দিল। তিনি উৎসাহ যোগালেন এই দুরন্ত দুর্নিবার তরুণকে।

দেখতে দেখতে ডিসেম্বর মাস এসে গেল। যে বাণিজ্য-বহরের সঙ্গী হয়ে কলম্বাস এসেছিলেন, তার বাকী দুটি জাহাজ আবার ভেসে পড়লো ইংল্যান্ডের উদ্দেশে। কলম্বাস এবারও জলপথে ভাসলেন। আটলান্টিকের নাড়ীর স্পন্দন তাঁকে অনুভব করতে হবে। জয় করতে হবে তার সুবিশাল হৃদয়।

মাসখানেক ইংল্যান্ডে কাটলো। কতো নাবিকের সঙ্গে আলোচনা, কতো সাগরতত্ত্বের বই, কতো অভিযানের কাহিনী জ্ঞানের ভাণ্ডার দিনে দিনে পূর্ণ করে চললেন কলম্বাস। তারপর সমুদ্রপথে যাবার অভিযান। উত্তর সাগর পার হয়ে আটলান্টিকের হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করতে করতে তিনি এসে পড়লেন আইসল্যান্ডের মাটিতে।

কী আশ্চর্য যোগাযোগ! এইখানেই একদিন তিনি খুঁজে পেলেন এক অভাবিত ইতিহাস। বহু যুগ আগে সভ্যতার উষালগ্নে ইউরোপের ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিল আর এক বিশাল মহাদেশ। ভয়ঙ্কর আটলান্টিক তাকে বিচ্ছিন্ন করে বহু দূরে মানুষের ধারণার আড়ালে ঠেলে দিয়েছে।

কিন্তু আকাশ তো বিচ্ছিন্ন হয় না। তার বুক বেয়ে আসে পাখিরা। সেই অজানা মহাদেশের মাটি তাদের ডানায়। সেখানের ফুল-ফলের বীজ তাদের শরীরের মধ্যে বাহিত হয়ে ইউরোপে ফুল ফোটায়। ফল ফলে।

অবাক হয়ে মানুষ দেখে। দুরন্ত কোনও সামুদ্রিক ঝড়ের পর স্রোতে ভাসতে ভাসতে তীরে এসে কতো গাছ মাঝে মাঝে পৌঁছে যায়। উপরে অজানা পাখির ঝাঁক।

আইসল্যাণ্ড তাঁকে উপহার দিল দুই দুঃসাহসী নাবিকের কাহিনী। লীফ এরিসন আর থর ফিন। তাঁরা এই দুস্তর মহাসমুদ্র পার হয়ে অপর পারে পৌঁছেছিলেন। নিয়ে এসেছিলেন এক নতুন দেশ, এক নতুন ভূখণ্ডের খবর। রেইজাভিক পর্বতমালার শান্ত সৌন্দর্যের কোল ছুঁয়ে কলম্বাস পশ্চিমের দিকে চেয়ে থাকেন। মন বলে—আছে, আছে, সে আছে। দিকচক্রবালের পর পারে সে বসে আছে তাঁরই অপেক্ষায়।

যে পথ দিয়ে কলম্বাস গিয়েছিলেন, সেই পথ দিয়ে তিনি কিন্তু ফিরলেন না। স্কটল্যাণ্ডের পশ্চিম এবং উত্তরের দ্বীপগুলি পরিভ্রমণ করে তিনি আইরিশ সাগর অতিক্রম করলেন। তারপর বিস্কে উপসাগর পার হয়ে ফিরে এলেন লিসবনে।

কয়েক মাসের মধ্যেই কী আশ্চর্য তাঁর পরিবর্তন! একটা সুদৃঢ় প্রত্যয়ের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত দৃষ্টি। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন ফেলিপা। কলম্বাস বললেন, তাঁর স্বপ্ন এখন সঙ্কল্পের মধ্যে রূপ নিয়েছে। এবার দিনে দিনে তিনি রচনা করবেন তাঁর আটলান্টিক অভিযানের রূপরেখা। সোনার দেশ ভারতে তাঁর পদচিহ্ন একদিন পড়বেই।

রাতের পর রাত সুগভীর চিন্তায় কখন কেটে যায়। কখনো দেখা দেয় দুশ্চিন্তা। আজ অবধি তাঁর স্বপ্নের সঙ্গী দু'জন, মাত্র দু'জন—পাওলো টসানেল্লী আর ফেলিপা মোনিস। পৃথিবীর আর কোনও মানুষই তাঁকে বিশ্বাস করে না। মানতে চায় না। তাঁর আজীবনের স্বপ্ন, তাঁর পরিকল্পনার সত্যতা। টসানেল্লী এখন বহুদূর, কিন্তু ফেলিপা? কলম্বাস তাঁর প্রাণের সঙ্গীকে জীবনসঙ্গী করে গ্রহণ করলেন একদিন। অপার আনন্দে কেটে গেল তিনটি বছর। অগাধ সম্পত্তি, অজস্র সম্মান। কলম্বাসের মনে হোল—জীবনের চরম লক্ষ্য তার সাফল্য। কিন্তু তার সঙ্গে চাই সম্পদ, চাই যুদ্ধজয়ের মর্যাদা। সারা পৃথিবীর মানুষের জন্যে যে অসাধ্য তিনি সাধন করবেন, তার বিনিময়ে চাই অজস্র উপঢৌকন, চাই অমরত্বের গৌরব, যার প্রতিশ্রুতি নিয়ে তিনি পার হবেন অসীম সাগর। সূর্যাস্তের পথ বেয়ে তিনি গড়ে তুলবেন এক নতুন সূর্যোদয়ের প্রত্যাশা।

[চলবে]

হাসপাতালে বাচ্চা বদল

লেখা ও ছবি : সমীর মণ্ডল

হাসপাতালে বাচ্চা পাল্টে সত্যিসত্যিই হয়ত যায় না। তাহলে খুবই মুশকিল। বুদ্ধিশুদ্ধির পাঠকদের কাছে সবটাই খুব মজার। মজার জন্যেই এখানে হাসপাতালের কথাটা আনলাম। ছোটবেলায় তোমরা অঙ্ক কষার সময় শিখেছ তিনটি সংখ্যাকে কতভাবে সাজানো যায়। অর্থাৎ 759 কে কতভাবে সাজানো যায়? 759, 795, 579, 597 975, 957 এই ছ'ভাবে সাজানো যায়। সেই রকমই একটা সাজানোর মজা নিয়ে এবারের বুদ্ধিশুদ্ধি।

হাসপাতালে চারটি বাচ্চা ডাক্তারি পরীক্ষার পর তাদের মায়ের কাছে ফেরৎ যাবে। কিন্তু তাদের পরিচয়ের লেবেল লাগানোর সময় দুজনের ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক লাগানো হয়েছে আর দুজনের ক্ষেত্রে বদলে গেছে লেবেল। এই ভুলের ব্যাপারটা কত ভাবে সাজানো যায়?

একটা ছক বানিয়ে দেখা যেতে পারে। দুটির ক্ষেত্রে ভুল হলে মোট ছ'ভাবে ব্যাপারটা ঘটতে পারে। ছক দেখে নাও।

এখন ধরো যদি ব্যাপারটা একটির ক্ষেত্রে ঘটে দুটির ক্ষেত্রে না হয়ে—তাহলে সেই ভুলের ব্যাপারটা কতভাবে সাজানো যেতে পারে?

তুমি কি একটা ছক বানালে নাকি? না আবিষ্কার করে করে ফেলেছ বুদ্ধিশুদ্ধির ব্যাপারটা?

ক	খ	গ	ঘ	
ক	খ	ঘ	গ	1
ক	ঘ	গ	খ	2
ক	গ	খ	ঘ	3
ঘ	খ	গ	ক	4
গ	খ	ক	ঘ	5
খ	ক	গ	ঘ	6

পাই

সুমন ঘোষ

না, সেই পুরান পাই-পয়সার কথা বলছি না। আজ আমি শোনাতে বসেছি একটি ধ্রুবক সংখ্যার কথা যেটি গ্রীক অক্ষর π (পাই) দ্বারা সূচিত হয়। যদিও 1706 খ্রীস্টাব্দে উইলিয়াম জোনস্ সর্বপ্রথম 'π' চিহ্নটি গণিতে ব্যবহার করেন, π এর ইতিহাস কিন্তু অত্যন্ত প্রাচীন। প্রাচীন ব্যাবিলনের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব 4000 সালে ব্যাবিলনবাসীরা জানত π এর আনুমানিক মান হল 3, হিপোক্রেটিস (Hippocraks of Chios) সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে বৃত্তের পরিধি ও ব্যাসের মধ্যে একটি সুনির্দিষ্ট সম্পর্ক আছে এবং বৃত্তের ক্ষেত্রফলকে ব্যাসার্ধের বর্গ দিয়ে ভাগ করলে ভাগফল একটি ধ্রুবক সংখ্যা হয় যাকে বর্তমানে π বলে চিহ্নিত করা হয়। হিপোক্রেটিস অবশ্য π এর মান নির্ণয়ের কোন চেষ্টা করেন নি। এ বিষয়ে সর্বপ্রথম তথ্য মেলে মিশরের আহমের প্যাপিরাস থেকে। খ্রীস্টপূর্ব 1650 সালের এই নিদর্শনটিতে আহম বলেছেন 9 একক ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল 8 (eight) একক বাহুবিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান। এ থেকে পরোক্ষভাবে π এর মান হয় 3·160493826.

1000 খ্রীস্ট পূর্বাব্দে বাইবেলে সলোমনের আদেশে একটি গোল পাত্র তৈরি প্রসঙ্গে π এর মানের যে আভাস পাওয়া যায় তা হল 3.

হিপোক্রেটিস এর সূত্র অনুসরণ করে π এর মান নির্ণয়ের গাণিতিক প্রচেষ্টা সর্বপ্রথম যিনি করেন তিনি হলেন আর্কিমিডিস (খ্রীস্টপূর্ব 287-212)। তিনি π এর যথার্থ মান নির্ণয়ের কোন চেষ্টাই করেন নি, বরং মানটির ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা ক্রমান্বয়ে নির্ণয় করে মানটির নিকটবর্তী হবার চেষ্টা করেছেন। গণিতের ইতিহাসে এই ধরনের ধারণা দানা বাঁধতে পরে দীর্ঘদিন লেগেছে। আর্কিমিডিসের মতে 'বৃত্ত হলো অসংখ্য বাহুবিশিষ্ট সুষম বহুভুজের অন্তিম দশা' (limiting case)। কোন নির্দিষ্ট পরিধির জন্য সমস্ত বন্ধ সামতলিক জ্যামিতিক আকারের মধ্যে বৃত্তের ক্ষেত্রফল বৃহত্তম। বাহুর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে গেলে বৃত্তে অন্তর্লিখিত সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল ক্রমশঃ বৃত্তের ক্ষেত্রফলের নিকটবর্তী হয় এবং একই ভাবে, বৃত্তে পরিলিখিত সুষম বহুভুজের ক্ষেত্রফল কমতে কমতে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের নিকটবর্তী হয়। তিনি বহুভুজের বাহুসংখ্যা 6 থেকে বাড়িয়ে 36 পর্যন্ত করে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা আনুমানিকভাবে নির্ণয় করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে π এর মানের ও ঊর্ধ্বসীমা ও নিম্নসীমা নির্ণয় করেন। তাঁর মতে $3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{7}$.

125 এবং 151 খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে টলেমী (Cladius Ptolemy of Hexandria) π একটি মান দেন। তাঁর মতে $\pi = 3 + \frac{2}{15} + \frac{1}{120} = 3{\cdot}1416666....$

480 খ্রীস্টাব্দে জনৈক চৈনিক গণিতবিদ্ Tsu-Chang Chi π এর একটি মান দেন যা ছয় দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক। এই মানটি প্রচলিত মান 22/7 এর থেকে অনেক বেশি নিখুঁত এবং একে সহজেই মনে রাখা যায়। এই মানটি হল $\pi = 355/113 = 3{\cdot}14159292...$ এছাড়াও অন্যান্য অনেক চৈনিক গণিতবিদ π এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। যেমন—Chang yeng (75-139 খ্রীস্টাব্দ) এর মতে π এর মান হল $\sqrt{10}$। Wang fun (229-267 খ্রীস্টাব্দ) বলে $\pi = 3{\cdot}155$. Ivinski' র মতে π এর মান হল 3.14। পঞ্চম শতাব্দীতে Chang-Chip বলেন যে π এর মান $\frac{22}{7}$ এবং $\frac{355}{113}$ র মধ্যবর্তী।

π এর মান নির্ণয়ে প্রাচীন ভারতীয় গণিতবিদদের অবদানও কম নয়। 499 খ্রীস্টাব্দে আর্যভট্ট বলেন

'চতুরধিকং শতমষ্টগুণং দ্বাষষ্টিস্তথা সহস্রাণাম্।
অযুতদ্বয়বিস্কম্ভস্যাসন্নো বৃত্তপরিণাহঃ।

অর্থাৎ 20000 একক ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের পরিধির দৈর্ঘ্য $(4+100)\times 8+62000 = 62832$ একক। এ থেকে π এর মান হয় 3·1416 যা চার দশমিক স্থান পর্যন্ত যথার্থ।

পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতবিদ ব্রহ্মগুপ্ত π এর মান নির্দেশ করেন $\sqrt{10}$।

1150 খ্রীস্টাব্দে ভাস্কর বৃত্তে অন্তর্লিখিত সুষম ষড়ভুজ থেকে শুরু করে সুষম 12, 24,...এইভাবে 384-ভুজ পর্যন্ত বহুভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় করেন। এর সাহায্যে তিনি π এর মান নির্ণয় করেছেন যেটি গণনায় আর্যভট্টের থেকে পৃথক (3927/1250) হলেও ফল একই অর্থাৎ 3·1416.

1200 খ্রীস্টাব্দে পিসার লিয়োনার্ডোর (Leonardo

from Pisa—known as Fibbanoci) গণনা অনুসারে $3\cdot140<\pi<3\cdot1421$

এর পরবর্তী যুগে যারা π নিয়ে গবেষণা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম অসামান্য সাফল্য লাভ করেন 'Leyden ইউনিভার্সিটি'র মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিঙের অধ্যাপক ডাচ্ গণিতবিদ 'Ludloph Van Ceulen' (1540-1610) তিনি তাঁর পত্নী 'Adriana Symonsz'র সঙ্গে যৌথ ভাবে π এর মান 35 দশমিক স্থান পর্যন্ত নির্ণয় করেন। এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য তৎকালীন ইউরোপীয় গণিতে πকে লুডল্ফের সংখ্যা বলে অভিহিত করা হত।

জ্যামিতির সাহায্য ব্যাতিরেকে π এর মান নির্ণয়ের প্রথম যথার্থ সূত্র দেন ফ্রাঙ্কোস ভিয়েতা (1540-1603)। তাঁর দেওয়া সূত্রটি হল π এর মান নির্ণয়ে ব্যবহৃত প্রথম অসীম শ্রেণী। তাঁর সূত্রটি হল

$$\frac{2}{\pi}=\frac{\sqrt{2}}{2}\cdot\frac{\sqrt{+\sqrt{2}}}{2}\cdot\frac{\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}}}{2}$$

লেইবনিজ্ π এর মান নির্ণয়ের জন্য যে সূত্র দেন তা হল

$$\tan^{-1}x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}-\frac{x^7}{7}+\ldots\ldots$$

এবং বিশেষ ক্ষেত্রে $x=1$ বসিয়ে পাওয়া যায়

$$\frac{\pi}{4}=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{5}-\frac{1}{7}+\ldots\ldots$$

লেইবনিজের (1646—1726) প্রায় সমসাময়িক যে দুজন গণিতবিদের নাম π এর ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত তারা হলেন লর্ড ব্রাউনকার (Lord Brouncker ; 1620-1684) এবং তাঁর বন্ধু জন ওয়ালিস্ (John Wallis ; (1616-1703)। লর্ড ব্রাউনকার রয়াল সোসাইটির অন্যতম প্রধান প্রতিষ্ঠাতা এবং এর প্রথম সভাপতি। ওয়ালিস π এর মান নির্ণয়ের যে সূত্রটি দেন তা প্রকৃত পক্ষে একটি অসীম গুণফল।

$$\frac{\pi}{2}=\prod_{n=1}^{\infty}\frac{(2n)(2n)}{(2n-1)(2n+1)}$$

লর্ড ব্রাউনকারের সূত্রটি হল

$$\frac{4}{\pi}=1+\cfrac{1^2}{2+\cfrac{3^2}{2+\cfrac{5^2}{2+\cdots}}}$$

লর্ড ব্রাউনকারের এই সূত্রটি পরবর্তীকালে উদ্ভূত অয়লারের (Euler) একটি সূত্রের বিশেষ রূপ। অয়লারের সূত্রটি নিম্নরূপ :

যদি $s=x/a-x^2/ab+x^3/abc-$

তাহলে $x/s=a+\cfrac{ax}{b-x+\cfrac{bx}{c-x-\cfrac{cx}{d-x+\cdots\cdots}}}$

1761 খ্রীস্টাব্দে J. H. Lambert প্রমাণ করেন যে π অমূলদ সংখ্যা।

1882 খ্রীস্টাব্দে F. Lindermann প্রমাণ করেন যে π অসীম রাশি।

1737 খ্রীস্টাব্দে অয়লার (Euler) এবং পরবর্তীকালে C. L. Dodgson (লুইস ক্যারল ছদ্মনামে 'এলিস ইন ওয়ান্ডারল্যান্ড' এবং 'থ্রু দি লুকিং গ্লাস' নামের দুটি বিখ্যাত শিশু কাহিনীর রচয়িতা) একটি 'অভেদ' দেন যার সাহায্যে π এর মান নির্ণয়ে বহু সূত্র তৈরি করা যেতে পারে। অভেদটি (Identity) হল নিম্নরূপ :

যদি $q=1+p^2$ হয়, তাহলে

$$\tan^{-1}\frac{1}{p}=\tan^{-1}\frac{1}{p+q}+\tan^{-1}\frac{1}{p+r}$$

এই অভেদটি ব্যবহার করে π এর মান নির্ণয়ের যে সূত্রগুলি তৈরি করা যেতে পারে সেগুলির কয়েকটি হল

$$\begin{aligned}\frac{\pi}{4}&=\tan^{-1}\frac{1}{2}+\tan^{-1}\frac{1}{3}\\&=2\tan^{-1}\frac{1}{3}+\tan^{-1}\frac{1}{7}\\&=2\tan^{-1}\frac{1}{5}+\tan^{-1}\frac{1}{7}+2\tan^{-1}\frac{1}{8}\\&=8\tan^{-1}\frac{1}{10}-\tan^{-1}\frac{1}{239}\\&\qquad-4\tan^{-1}\frac{1}{515}\qquad\text{(A)}\\&=5\tan^{-1}\frac{1}{7}+2\tan^{-1}\frac{3}{79}\\&=4\tan^{-1}\frac{1}{5}-\tan^{-1}\frac{1}{239},\ \text{ইত্যাদি।}\end{aligned}$$

প্রমাণ করা যায় যে,

$$(1-y^2)^{1/2}\sin^{-1}y=y+\frac{2}{3}y^3+\frac{2\cdot4}{3\cdot5}y^5+\cdots\cdots$$

এবং সেখান থেকে

$$\tan^{-1}\frac{m}{n}=\frac{mn}{m^2+n^2}\left[1+\frac{2}{3}\cdot\frac{m^2}{m^2+n^2}+\frac{2\cdot4}{3\cdot5}\left(\frac{m^2}{m^2+n^2}\right)^2+\ldots\ldots\right]$$

যদি 'A' চিহ্নিত সূত্রগুলির $\tan^{-1}$ পদগুলিকে বিস্তৃতির জন্য উপরোক্ত সূত্রটিকে কাজে লাগান হয় তবে দেখা যাবে যে যদি m^2+n^2 10-এর কোন ঘাত বা উহ্য

ধারের কোন উপযুক্ত গুণিতক হয় তাহলে গণনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি A চিহ্নিত সূত্রগুলির পঞ্চম সূত্রটিকে ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে

$$2(1^2+7^2)=10^2, \quad 16(3^2+79^2)=10^3$$

এবং $$\frac{\pi}{4}=\frac{7}{10}\left[1+\frac{2}{3}\left(\frac{2}{100}\right)+\frac{2\cdot4}{3\cdot5}\left(\frac{2}{100}\right)^2+\cdots\cdots\right]$$

$$+\frac{7584}{100000}\left[1+\frac{2}{3}\left(\frac{256}{100000}\right)+\frac{2\cdot4}{3\cdot5}\left(\frac{256}{100000}\right)^2+\cdots\right]$$

এই পদ্ধতিতে গণনা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে যায়।

অপর একটি অভিসারী শ্রেণীর সাহায্যে অত্যন্ত দ্রুত π এর মান পাওয়া যায়। উচ্চতর গণিতের সাহায্যে দেখানো যায় যে যদি

$$b=\frac{1}{2}\left[\frac{4\sqrt{2}-1}{4\sqrt{2}+1}\right] \text{ হয়}$$

তাহলে

$$\pi=\log e\ \frac{1}{b}-2b^4-13b^8-\frac{365}{3}b^{12}$$

$$-\frac{2701}{2}b^{16}\cdots\cdots$$

যেহেতু b এর মান অত্যন্ত ক্ষুদ্র

$b=0{\cdot}043213616862944896021937 8\cdots$

সেজন্য উপরোক্ত শ্রেণীতে π এর যে সূত্র দেওয়া হয়েছে তা অত্যন্ত দ্রুত π এর প্রকৃত মানের অভিসারী হয়। কেবল মাত্র প্রথম পদটি অর্থাৎ log e 1/b পাঁচ দশমিক স্থান পর্যন্ত π এর যথার্থ মান দেয়। আমরা নিচের π এর মান গণনার জন্য উপরোক্ত সূত্রটির পাঁচটি পদ ব্যবহার করে দেখাতে পারো যে 22 দশমিক স্থান পর্যন্ত π এর নির্ভুল মান পেতে পারি।

$\pi=3{\cdot}14159\ 9$

$=3{\cdot}14159\ 2653\ 7$

$=3{\cdot}14159\ 2653\ 58979\ 8$

$=3{\cdot}14159\ 2653\ 58979\ 3238\ 6$

$+3{\cdot}14259\ 2653\ 58979\ 3238\ 4626\ 5$

π এর প্রকৃত মান হল

$\pi=3{\cdot}14159265358979323846264338327950$
$2884197169399\cdots\cdots$

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই বহু গণিতবিদ অসীম শ্রেণীর সাহায্যে π এর মান নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই সাফল্য অর্জন করেছেন।

কিন্তু π এর প্রকৃত মান যাই হোক না কেন, গণিতে π একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ধ্রুবক রাশি এবং বর্তমান যুগে গণিতের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই π এর প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

C/o. বি. এন. চ্যাটার্জী, পোঃ পোদড়া, হাওড়া-9।

বিজ্ঞান সংবাদ

আচার্য স্মরণ

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 125তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর গত 2রা আগস্ট 1987 এক আলোচনাচক্রের আয়োজন করেছিলেন। কলকাতা তথ্যকেন্দ্রে অনুষ্ঠিত 'সমাজ ও বিজ্ঞান' শীর্ষক এই আলোচনা চক্রের যৌথ উদ্যোক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানসূচী ছিল সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স-এ। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অসীম কুমার দাশগুপ্ত। আলোচনাচক্রে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবিগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আচার্য রায়ের জীবন ও কর্মের উপর বিড়লা ইণ্ডাসট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনলজিক্যাল মিউজিয়াম-এর সহায়তার একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়।

সায়েন্স অ্যাপ্টিচিউড অ্যাণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট '87

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েসন এর পশ্চিমবঙ্গ শাখা এবারেও অন্যান্য বছরের মতো সায়েন্স অ্যাপ্টিচিউড অ্যাণ্ড ট্যালেণ্ট সার্চ টেস্ট ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছেন। ভৌত বিজ্ঞান, জীবন বিজ্ঞান, গণিত ও সাধারণ জ্ঞানের উপরে ইংরাজী ও বাংলায় প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হবে। চতুর্থ, পঞ্চম/ষষ্ঠ, সপ্তম/অষ্টম ও নবম/দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। সফল প্রতিযোগীদের অর্থ ও সার্টিফিকেট পুরস্কারস্বরূপ অর্পণ করা হবে। পরীক্ষা গৃহীত হবে আগামী 1লা নভেম্বর 1987। নাম নথিভুক্ত করণের শেষ দিন 10 সেপ্টেম্বর 1987। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের নিয়মাবলীসহ প্রশ্নের নমুনা ও অন্যান্য বিস্তৃত তথ্যের জন্য নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

অল ইণ্ডিয়া সায়েন্স টিচার্স এসোসিয়েসন (পঃ বঃ)
98 বেলতলা রোড, কলিকাতা-26
বিভিন্ন বছরের নমুনা প্রশ্নপত্র (সরবরাহ সাপেক্ষে) নিম্ন ঠিকানাতেও পাওয়া যাবে
শৈবা প্রকাশন 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড কল-9

ওয়েষ্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটীর অনুষ্ঠান

গত 14 জুলাই ওয়েষ্ট বেঙ্গল সায়েন্স সোসাইটী আয়োজিত নিখিলবঙ্গ রচনা ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সেনহাটীতে অনুষ্ঠিত এই ঘরোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট পক্ষিবিজ্ঞানী শ্রীঅজয় হোম। জগদীশ চন্দ্র স্মারক পুরস্কার অর্পণ করা হয় রীনি গাঙ্গুলীকে। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মহুয়া দাস ও পার্থসারথি রুদ্র।

ইলেকট্রোলিসিস ও ইলেকট্রোনেগেটিভিটি

অমরনাথ রায়

ইলেকট্রোলিসিস বা 'তড়িৎ-বিশ্লেষণ' সম্বন্ধে জানতে গেলে প্রথমে জানতে হবে 'তড়িৎ বিশ্লেষ্য' পদার্থ কাকে বলে। কস্টিক সোডা, সোডিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি কতকগুলি যৌগিক পদার্থ দ্রবণে অথবা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎ পরিবহণ করে এবং তড়িৎ পরিবহণের সময় ঐ পদার্থগুলি বিশ্লিষ্ট হয়ে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করে। রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে তড়িৎ পরিবহণে সক্ষম এই সব পদার্থকে বলা হয় 'তড়িৎ বিশ্লেষ্য'। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি যৌগগুলিও উত্তম তড়িৎ বিশ্লেষ্য।

দ্রবীভূত বা বিগলিত অবস্থায় তড়িৎবিশ্লেষ্য পদার্থ দ্বারা তড়িৎ পরিবহনের সময় তড়িৎ বিশ্লেষ্য পদার্থের যে রাসায়নিক পবিবর্তন ঘটে সেই সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটিকে 'তড়িৎ বিশ্লেষণ' বলা হয়। তড়িৎ-বিয়োজনবাদের পরিপ্রেক্ষিতে তড়িৎ বিশ্লেষণের সংজ্ঞা এইভাবে দেওয়া যায়ঃ দ্রবীভূত বা গলিত অবস্থায় উপযুক্ত তড়িৎদ্বারের মাধ্যমে তড়িৎ-বিশ্লেষ্য পদার্থে তড়িৎ প্রবাহিত করলে বিয়োজনের ফলে সৃষ্ট আয়নগুলি পরস্পর বিপরীতধর্মী তাড়িৎদ্বারে আকৃষ্ট হয় এবং সেখানে ইলেকট্রন গ্রহণ অথবা বর্জন দ্বারা প্রশমিত হ'য়ে তড়িৎদ্বারে নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে। তড়িৎ-বিশ্লেষ্যের এই রকম পরিবর্তনকে 'তড়িৎ বিশ্লেষণ' (ইলেকট্রোলিসিস) বলে।

সোডিয়াম ক্লোরাইড গলিত অবস্থায় Na^+ আয়ন এবং এবং Cl^- আয়নে বিয়োজিত হয়। $NaCl = Na^+ + Cl^-$ প্ল্যাটিনাম ক্যাথোড এবং গ্রাফাইট অ্যানোড ব্যবহার করে গলিত সোডিয়াম ক্লোরাইডের তড়িৎ বিশ্লেষণ করলে Na^+ আয়ন ক্যাথোডের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং ক্যাথোডে পেঁৗছে ইলেকট্রন গ্রহণ করে তড়িৎ নিরপেক্ষ সোডিয়াম পরমাণুতে রূপান্তরিত হ'য়ে ক্যাথোডে সঞ্চিত হয়। $Na^+ + e \rightarrow Na$। অপরপক্ষে Cl^- আয়ন অ্যানোডের দিকে যায় এবং সেখানে পেঁৗছে একটি ইলেকট্রন পরিত্যাগ করে তড়িৎ নিরপেক্ষ ক্লোরিন পরমাণু গঠন করে। তারপর দুটি ক্লোরিন পরমাণু পরস্পর সংযুক্ত হ'য়ে ক্লোরিন অণুতে পারণত হ'য়ে অ্যানেডে মুক্ত হয়। $Cl^- - e \rightarrow Cl$; $Cl + Cl = Cl_2$

ইলেকট্রনের চলনই তড়িৎ পরিবহনের দিক নির্ণয় করে। তড়িৎ বিশ্লেষ্যের ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন একই দিকে তড়িৎ পরিবহণ করে। ইলেকট্রোলিসিসের সময় অ্যানোডে জারণ এবং ক্যাথোডে বিজারণ ক্রিয়া সংঘটিত হয়। ইলেকট্রোলিসিস প্রক্রিয়ায় দ্রবণে যতগুলি ইলেকট্রন প্রবেশ করে, ঠিক ততগুলি ইলেকট্রনই দ্রবণ থেকে বেরিয়ে আসে।

'ইলেকট্রোনেগেটিভিটি' হলো মৌলের এক অতি গুরুত্বপূর্ণ তড়িৎ রাসায়নিক ধর্ম। বিজ্ঞানী পাউলিং ইলেকট্রোনেগেটিভিটির যে সংজ্ঞা দেন তা এই রকমঃ "স্থায়ী সমযোজী যৌগের অণুর মধ্যেকার কোন মৌলের পরমাণুর যোজক ইলেকট্রনযুগলকে পরমাণু তার নিজের দিকে আকর্ষণ করার একটি সহজাত প্রবণতা দেখায়। ঐ সহজাত প্রবণতা বা ধর্মকেই মৌলটির অপরাতড়িৎধর্মিতা (ইলেকট্রোনেগেটিভিটি) বলা হয়।

রাসায়নিক মিলনের সময় যে মৌলের পরমাণু ইলেকট্রন ত্যাগ অপেক্ষা ইলেকট্রন গ্রহণের প্রবণতা বেশি দেখায় তাকে বলা হয় 'ইলেকট্রোনেগেটিভ এলিমেন্ট' বা অপরাতড়িৎধর্মী মৌল। আবার কোন মৌলের বিচ্ছিন্ন পরমাণু (isolated atom) যেমন ইলেকট্রন আকর্ষণ করতে পারে, তেমনই আবার তা কোনও অণুর মধ্যে আবদ্ধ থেকেও ইলেকট্রন আকর্ষণের প্রবণতা দেখায়। তবে বিভিন্ন মৌলের ইলেকট্রন আসক্তির প্রবণতা সমান নয়।

মনে করা যাক্ X এবং Y দুটি অসম পরমাণু ইলেকট্রন জোড়ের সাহায্যে XY নামক সমযোজী যৌগের একটি অণু গঠন করেছে। নিচের সংকেতের সাহায্যে যৌগটির তড়ি- প্রকৃতির বিচার করা যাবে।

X : Y	X : Y	X : Y
(প্রথম ক্ষেত্র)	(দ্বিতীয় ক্ষেত্র)	(তৃতীয় ক্ষেত্র)

প্রথম ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রন জোড়াটি X এবং Y পরমাণু দু'টির কেন্দ্র হ'তে সম দূরত্বে আছে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইলেকট্রনজোড়াটি X অপেক্ষা Y এর পরমাণুকেন্দ্রের নিকটে অবস্থান করছে।

উপরের তিনটি সংকেত থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে (i) প্রথম ক্ষেত্রে X এবং Y পরমাণু দু'টির ইলেকট্রোনেগেটিভিটি সমান। (ii) দ্বিতীয় ক্ষেত্রে X এর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি Y এর চেয়ে বেশি। (iii) তৃতীয় ক্ষেত্রে Y এর ইলেকট্রোনেগেটিভিটি X এর চেয়ে বেশি।

যে পরমাণুর সমযোজী বন্ধনের ইলেকট্রন জোড় আকর্ষণ করবার প্রবণতা যত বেশি, সেই পরমাণুর ইলেকট্রোনেগেটিভিটির মান সবচেয়ে কম 0·7 এবং ক্লোরিন এর ইলেকট্রোনেগেটিভিটির মান সবচেয়ে বেশি (4·0)। ইলেকট্রোনেগেটিভিটি একটি তুলনামূলক সংখ্যা। তাই এর কোন একক নেই।

বিশেষ রচনা

অফুরন্ত শক্তির উৎস—সূর্য

সূর্যেন্দুবিকাশ করমহাপাত্র

জ্বালানী হিসেবে আমাদের কয়লা, পেট্রোলিয়াম ও গ্যাসের উপর নির্ভর করতে হয়। এই সব জ্বালানীর সাহায্যে কলকারখানা চলে, গাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি যানে যাতায়াত করা যায়। এমন কি বিদ্যুৎ উৎপাদনেও এরাই শক্তির উৎস। আধুনিক যুগে নিউক্লীয় শক্তি এদের সঙ্গে যুক্ত হলেও তার প্রসারে নানা আপত্তি আছে। নিউক্লীয় শক্তির উৎপাদনে যে তেজস্ক্রিয়ার সমস্যা থাকে তার দূষণ জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকর। নিউক্লীয় শক্তির উৎস ইউরেনিয়ামও কিছু অফুরন্ত নয়। কয়লা, তেল গ্যাসের মত ক্রমশ ব্যবহারের ফলে তার ভাণ্ডারও ফুরিয়ে যাবে একদিন। কয়লা তেলের যোগান নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠেছে যে এদের ভাণ্ডারে টান পড়ছে। তাহলে আমাদের সভ্যতার মূলে যে শক্তির কেরামতি তা আর কতদিন চলছে? চলবে না যদি বিকল্প কোন উৎস না পাওয়া যায়। তাই বিকল্প এমন উৎস খুঁজে পেতে হবে যা কখনও ফুরিয়ে যাবে না।

শক্তির এ রকম অফুরন্ত উৎস হল সূর্য। আবহমান কাল থেকে সূর্য আলো ও তাপ বিকিরণ করে আসছে। তার একদিনও কামাই নেই। অথচ রোদে কাপড় শুকিয়ে নিতে কোন খরচ নাই। দিদিমারা আচারের ভাঁড়গুলো মাঝে মাঝে রোদে দেন, তখন আমাদের জিভে জল এসে যায়। রোদ সেখানে বাড়তি রসটুকু শুকিয়ে দেয়, ছাতা পড়তে দেয় না। সূর্য জীবাণু নাশেও সাহায্য করে। সূর্যের উত্তাপ এভাবে কাজে লাগানো আদিমকাল থেকে চলে আসছে। গাঁয়ের মানুষজন ধান সিদ্ধ করে ভানতে দেওয়ার আগে শুকিয়ে নেয়। এসব তো রোজকার ঘটনা।

কিন্তু কয়লা ইত্যাদি ফুরিয়ে গেলে সূর্য থেকে শক্তি কি তার জায়গা নিতে পারবে? নিতে পারলে কয়লার মত তার ফুরিয়ে যাবার ভয় থাকবে না? কিন্তু কয়লার কাজ কি সূর্যের তাপ বা আলো দিয়ে সম্ভব হবে? তা যে হবে না তার কারণ হল সূর্যের শক্তি সংগ্রহ করে রাখা সহজ নয়। অথচ এই শক্তির পরিমাণ পৃথিবীতে কিছু কম নয়। উষ্ণ অঞ্চলে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে বায়ুমণ্ডলের উপর 1 কিলোওয়াটের বেশি সৌরশক্তি এসে পড়ে। পৃথিবীর 20 মিলিয়ন বর্গ কিলোমিটার জায়গা তো মরুভূমি। সেখানে না আছে গাছপালা না আছে মানুষজন। অথচ এই সব অঞ্চলে বছরে সূর্যের মোট যত তাপ এসে পড়ে তাতে সারা পৃথিবীর কয়লা তেল প্রভৃতি থেকে যে শক্তির খরচ হয় তার প্রায় 400 গুণ। অথচ এত বিপুল শক্তির কিছু অংশও ব্যবহার যোগ্য শক্তিতে রূপান্তর করা যায় না। তাই শক্তির উৎস হিসেবে সূর্য একেবারে শীর্ষস্থানীয় কিন্তু এই শক্তির কার্যকরী রূপান্তরই হল বড় সমস্যা।

সূর্যের তাপ ও আলো পরোক্ষভাবে খাদ্য ও গাছপালার ভেতর রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। বাতাস ও সাগরের জোয়ারের গতীয় শক্তি ও সৌরশক্তির রূপান্তর। এসব রাসায়নিক ও গতীয় শক্তিকে আমরা কাজে লাগাতে পারি। যেমন খাদ্য থেকে তো কাজ করার শক্তি কাজে লাগাবার চেষ্টাও চলছে, তবে সে অন্য প্রসঙ্গ। সূর্য থেকে সোজাসুজি যে আলো ও তাপ পাওয়া যায় তা কি আমরা কাজে লাগাতে পারি? অতীতের ইতিহাস খুঁজলে দেখা যাবে যে খ্রীস্টপূর্ব 212 অব্দে রোমান সৈন্যরা যখন সিরাকুজ অবরোধ করেছিল, তখন আর্কিমিডিস চেষ্টা করেছিলেন প্রতিফলক দর্পণে সূর্যের আলো ফেলে শত্রু-পক্ষকে পুড়িয়ে মারতে। দ্বাদশ শতকের লেখক Ionne Zoaras এর রচনা থেকে জানা যায় যে 626 খৃস্টাব্দে ভিটেলিয়াস্ বাহিনীর কনস্টান্টিনোপল অবরোধের সময় প্রোক্লুস আর্কিমেডিসের অনুরূপ দর্পণের সাহায্য নিয়েছিলেন।

সতের শতকে কাঁচ শিল্পের প্রভূত উন্নতির ফলে আলোর জন্য ব্যবহার্য কাঁচ গুরুত্ব পায়। 1609 খৃস্টাব্দে গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে আলোর সাহায্যে বাইরের বিশ্বকে দেখার এক নতুন দরজা খুলে দেন। ঐ শতকে কয়েকজন বিজ্ঞানী কাঁচের দর্পণে সূর্যের আলো সংহত করে আগুন জ্বালাবার চেষ্টায় সফল হয়েছেন। উনিশ শতকে ফ্রান্সে অগাস্টিন মোসট ও আবেল পিফার ধাতুর তৈরি প্রতিফলক দিয়ে সৌরশক্তিতে এমন কি একটি বাষ্পীয় এঞ্জিন চালিয়ে

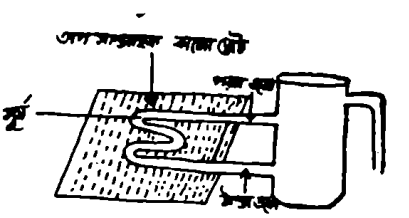

চিত্র - ১: সৌর হিটার

তাঁদের মুদ্রণ যন্ত্র চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। এরকম আরও কিছু চেষ্টা তখন আংশিকভাবে সফল হয়েছিল। কিন্তু কয়লার মত সুবিধাজনক জ্বালানীর সঙ্গে সৌরশক্তি প্রতিযোগিতায় পেরে ওঠেনি। তার কারণ হল কয়লা থেকে শক্তি সংগ্রহের প্রযুক্তি তত জটিল নয় এবং খরচও অনেক কম।

এখন কয়লা প্রভৃতি জ্বালানীর ভাঁড়ারে টান পড়ছে বলেই পুরনো সেই সব পদ্ধতিতে সৌরশক্তি সংগ্রহ করে কাজে লাগানোর কথা ভাবা হচ্ছে। তা নিয়ে কিছু কাজও এগিয়েছে। সবচেয়ে সহজ যে উপায় আছে তা হল সমতল কালো প্লেটের তলদেশে জলের পাইপ দিয়ে (চিত্র 1) সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে গরম জল আধারের উপরিভাগে চালিত করা যায়। কালো পদার্থ তাপের ভাল শোষক তাই মসৃণ ধাতব প্লেটের উপর নিকেল অক্সাইড বা সালফাইডের পাতলা স্তর দিয়ে ভাল তাপ সংগ্রাহক তৈরি করা যায়। মসৃণ তলের বিকিরণ ক্ষমতা কম আবার কালোরঙের শোষণ ক্ষমতা বেশি। তাই এরকম কালো আবরণের মসৃণ প্লেট তাপের ভাল সংগ্রাহক। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, ইজরায়েল প্রভৃতি দেশে এরকম সৌর হিটার বাজারে কিনতে পাওয়া যায়। ভারতেও এখন এরকম হিটার কিছু কিছু কিনতে পাওয়া যাচ্ছে। ইজরায়েলে এই ধরনের দু বর্গমিটার আয়তনের হিটার দিয়ে 180—270 লিটার জল গরম করা সম্ভব হয়েছে।

সমতল প্লেটের চেয়ে অবতল দর্পণে দ্রুত তাপ কেন্দ্রীভূত বা ফোকাস হতে পারে তাই তার সংগ্রহ ক্ষমতা বেশি। 1·2 মিটার ব্যাসের অবতল দর্পণে পনের মিনিটে এক লিটার জল ফুটন্ত অবস্থায় আসতে পারে। ফ্রান্সের পার্বত্য অঞ্চলে বড় বড় অবতল দর্পণের সাহায্যে 4000°C পর্যন্ত উত্তপ্ত ফার্নেস সৌরতাপ থেকে তৈরি করা সম্ভব হয়েছে।

অবতল দর্পণের বড় অসুবিধা হল দর্পণ সর্বদাই সূর্যের দিকে মুখ ফিরে থাকা চাই, সমতল প্লেটে তা প্রয়োজন হয় না। এ রকম সমতল প্লেটে সূর্যের তাপ সংগ্রহ করে ধরা যাক কোন ইঞ্জিন 65°সেঃ উষ্ণতায় চালু করা গেল, ইঞ্জিন থেকে যে শক্তি পাওয়া গেল তাতে যদি 40°C উষ্ণতায় ইঞ্জিনের তাপ নেমে আসে তবে তার শক্তি উৎপাদনের ক্ষমতা হবে মাত্র শতকরা 10 থেকে 12 ভাগ। সাধারণত কয়লা চালিত ইঞ্জিনে এই ক্ষমতা অনেক বেশি—ত্রিশ থেকে চল্লিশ। মোটর শক্তি থেকে এ রকম নিচু মানের ইঞ্জিন তৈরিতে এমন কি গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলেও তিরিশ থেকে পঞ্চাশ বর্গ মিটার আয়তনের সংগ্রাহক প্রয়োজন হবে যাতে অন্তত এক কিলোওয়াট শক্তি পাওয়া যেতে পারে। আর তা সম্ভব হবে যখন নির্মল আকাশে সূর্য দুপুরে সবচেয়ে বেশি তাপ দিতে সক্ষম। 1913 খ্রীস্টাব্দে ইজিপ্টে নীলনদের জল তুলতে 40 কিলোওয়াটের এ রকম একটি ইঞ্জিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছিল। নিউ মেক্সিকোতে হ্যারিংটন সৌরতাপ চালিত ইঞ্জিনে জল উঁচু একটি আধারে তুলে দিয়ে, সেই জলের নিম্নমুখী প্রবাহে একটি বিদ্যুৎ জেনারেটর চালাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তুলনামূলকভাবে এসব পরীক্ষা অর্থ সাশ্রয়কারী প্রযুক্তিতে কয়লার কাছে হেরে গেছে। তবু এই সব প্রযুক্তি আরও উন্নত করার চেষ্টা হচ্ছে যাতে কয়লার অভাবে না বিপদে পড়তে হয়।

সূর্যতাপ থেকে সাগরের জল পাতনের সাহায্যে লবণ মুক্ত করার পদ্ধতি অনেকদিন আগেই চালু আছে। এই পদ্ধতিতে কালো তাপশোষী মেঝেতে লোণা জল প্রবাহিত রাখা হয়। সূর্যের তাপ এই জল পাতনের প্রক্রিয়ায় মেঝের

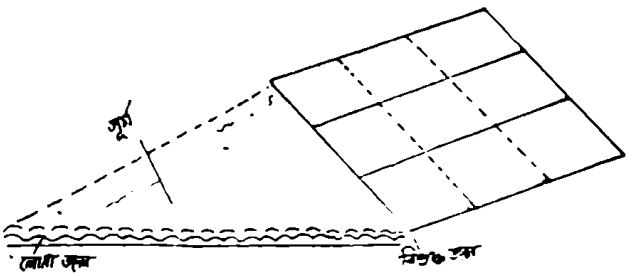

চিত্র-২: সৌর পাতন পদ্ধতি

উপরে ঢালু কাঁচের আবরণে ঘনীভূত হয় ও সংগ্রাহক নালীতে বিশুদ্ধ জল সঞ্চিত হয় (চিত্র 2)। কাঁচের আবরণে সূর্যের তাপ সহজে চলে যেতে পারে। কাঁচের আবরণ ঢাল হওয়ায় ঘনীভূত জল সহজে গড়িয়ে পাশের নালীতে সঞ্চিত হতে পারে। এ রকম পাতন পদ্ধতিতে সারাদিনে এক বর্গমিটারে প্রায় 4 লিটার জল শোষণ করা যায়।

অধিবৃত্তাকার সিলিণ্ডার দর্পণের অক্ষ সূর্যের দিকে সোজা রেখে তাপ কেন্দ্রীভূত করার দক্ষতা বাড়ানো যায়।

সূর্যের তাপ এভাবে সোজাসুজি শক্তিতে রূপান্তর করার যে সব গবেষণা চলছে তাতে সমস্যার সমাধান হয় নি। কারণ শক্তি সংগ্রহে অর্থসাশ্রয়ের কথা ভাবতে হয়। হিসেব নিকেশ করে তত্ত্ব যা পাওয়া যায় প্রযুক্তিতে তা কাজে লাগানো এখনও সম্ভব হচ্ছে না।

সূর্যের আলো থেকে ফোটো-ভোল্টাইক এফেক্টের সাহায্যে বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। খাঁটি সিলিকনে সামান্য বোরন ভেজাল দিয়ে যে কৃস্ট্যাল পাওয়া যায় তাতে সূর্যের আলো বিদ্যুতে রূপান্তরিত হয়। এরকম সৌরকোষ মহাকাশযানে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখনও পদ্ধতিটি আর্থিক দিক থেকে সুলভ নয়। এক কিলোওয়াট বিদ্যুৎ তৈরিতে 20—50 হাজার ডলার খরচ হয়। ক্যাডমিয়াম সালফাইড, ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড প্রভৃতি নতুন নতুন কৃস্ট্যাল তৈরি করে খরচ

কমানো ও পদ্ধতিটির দক্ষতা বাড়ানোর চেষ্টা চলেছে। এখনও লক্ষ্যে পেঁছুনো যায় নি। তবে পদ্ধতিটি এখন যে উন্নতি সম্ভব হয়েছে তাতে লিমেয়ার ও তাঁর সহযোগীরা ভায়োলেট কোষ দিয়ে সাধারণ সিলিকন কোষ থেকে বেশি দক্ষতায় বিদ্যুৎ রূপান্তর সম্ভব করেছেন।

সিবেক এফেক্ট হল অন্য একটি ক্রিয়া যাতে দুটি অসম ধাতুর সংযোগস্থলে তাপের পার্থক্য থাকলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এডিসন এফেক্ট কোন ধাতু প্রায় 1500°C উষ্ণতায় উত্তপ্ত হলে ইলেকট্রন নির্গত হয় ও ·01 ইঞ্চি দূরের ধাতু ফলকে তা সঞ্চিত হতে পারে। এ ভাবে একটি বিদ্যুৎ বর্তনী তৈরিও করে যায়। কিন্তু সৌর তাপ থেকে এই সব পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এখনও সম্ভব মনে হয় না।

যদিও সৌরশক্তির মোট পরিমাণ যথেষ্ট কিন্তু এলোমেলো ছড়িয়ে থাকে তাই সংগ্রহ করা শক্ত। কিছু সংগ্রহ করা গেলেও শক্তিতে রূপান্তরের যান্ত্রিক দক্ষতা নিতান্তই অল্প। তাছাড়া রূপান্তর পদ্ধতি এখনও অর্থ সাশ্রয়কারী নয়—তাই ছোট ছোট কাজে ব্যবহার ছাড়া সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ ব্যাপক হতে পারে নি।

সৌরশক্তি ব্যবহারের বড় বাধা হচ্ছে তা নিয়ত পরিবর্তনশীল। ঋতুভেদে এই পরিবর্তন আবার আবহাওয়ার জন্য এলোমেলো হয়ে পড়ে। তাই সৌরশক্তি সংগ্রহ করে সঞ্চিত রাখার নানা চেষ্টা হচ্ছে। সূর্যের তাপ যখন প্রখর তখন সৌরশক্তি চালিত পাম্পে উঁচুতে জল তুলে দেওয়া যায়। প্রয়োজন মত সেই জল নিম্নাভিমুখী করে টারবাইন চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের চেষ্টা করা যায়। ব্যাপারটা যেন সৌরশক্তি দিয়ে ক্ষুদে জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি আর কি! এরকম পরিকল্পনা কার্যত এখনও অচল। কেউ কেউ সৌর জলাশয়ে শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করেছেন। এই জলাশয়ের তলদেশে থাকে বেশ ঘন ব্রাইন জাতীয় তরল পদার্থ। উপরের স্তরে সাধারণ জল। জলের ঘনত্ব কম বলে ব্রাইনে মিশ খায় না। তলদেশের তাপশোষী পদার্থের তাপে ব্রাইন উষ্ণ হয়ে তাপ সঞ্চয় করে রাখে। জল অপরিবাহী বলে সেই তাপ বেরিয়ে যেতে পারে না। এভাবে 100°C পর্যন্ত উষ্ণতায় তাপ জমানো যায়। কিন্তু সেই তাপ কাজে লাগাতে গেলে জল ও ব্রাইন মিশে যাওয়ার সমস্যা থাকে।

গ্লউবার সল্ট (Na_2So_4, $10H_2O$) এমন একটি রাসায়নিক পদার্থ যার প্রতি কিলোগ্রামে প্রায় 67 ওয়াট-ঘন্টা শক্তি সঞ্চিত থাকতে পারে। এই অবস্থায় লবণ আর কৃস্ট্যাল আকারে থাকে না, গলে যায়। ঠাণ্ডা করলে, এই সঞ্চিত তাপ ফিরে পাওয়া যায়, তখন লবণ পুনরায় কৃস্ট্যাল গঠনে ফিরে আসে।

1968 খ্রীস্টাব্দে গ্লেসার প্রস্তাব করেন যে মহাকাশের বিশাল কোন স্টেশন থেকে সিলিকনের বহুসংখ্যক সৌরকোষ থেকে মাইক্রোওয়েভ উৎপাদন করে পৃথিবীতে পাঠান যায়। স্টেশনটি পৃথিবী থেকে অন্তত 22300 মাইল দূর হবে। এরকম বৃহৎ মহাকাশ বিদ্যুৎ কেন্দ্র মাইক্রোওয়েভ থেকে 10 মিলিয়ন কিলোওয়াট বিদ্যুৎ যোগান দিতে পারে। মাইক্রোওয়েভ পাঠানো দূর মহাকাশ থেকে সহজ হবে।

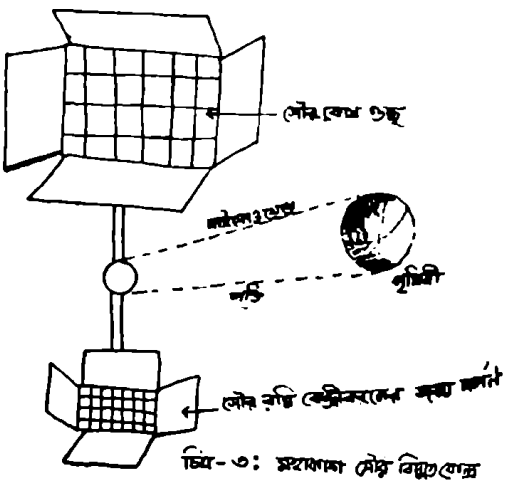

চিত্র-৩: মহাকাশ সৌর বিদ্যুৎকেন্দ্র

এ ছাড়া আরও নানা প্রস্তাব আছে যাতে সৌরশক্তিকে কাজে লাগান যায়। কিন্তু এখনও সে সব প্রস্তাব কার্যকরী হতে অনেক গবেষণার প্রয়োজন। সূর্য আমাদের প্রতিদিনের সঙ্গী, সূর্যের আলো তাপ আমাদের কত কাছের। তবু সূর্যের এই সব শক্তিকে রূপান্তর করার প্রযুক্তি যে কত কঠিন তা এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ। ভবিষ্যতে উন্নততর প্রযুক্তিতে যদি সাফল্য আসে তবে মানুষ অফুরন্ত শক্তির এক উৎসের আধিপত্য পেয়ে যাবে।

সল্টলেক। কলকাতা-64

আমাদের কাছারির চাপরাশি আর ফুলবাসী একবার কচ্ছপের খোঁজে জঙ্গলে গিয়েছিলাম। জায়গাটা কালিনগরের হাট থেকে একটু দূরে। গাজির চর বলে পরিচিত। জঙ্গল থেকে ঢালু হয়ে অনেকখানি গিয়ে নদীতে মিশেছে। জোয়ারে চর ডুবিয়ে জল ওঠে জঙ্গল পর্যন্ত আবার ভাটায় জল নেমে যায়। ঐ চরে কোনো গাছপালা নেই এমনকি একটা ধানি ঘাসের চারা পর্যন্ত নেই। ফুলবাসী আমাকে নদীর কিনারায় নিয়ে গেল, তারপর নিচু হয়ে মাটিতে কি যেন দেখতে লাগল। আমাকে বলল, দেখ দেখ! কচ্ছপের পায়ের ছাপ। সত্যি কচ্ছপ নদী থেকে যে বালীর ওপর দিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেছে তার পায়ের ছাপ স্পষ্ট। একটু উপরের দিকে বালীর স্তরের ওপর কোচের শিক ঢুকিয়ে দিয়ে গুতো দেয় ঢপ্ ঢপ্ আওয়াজ হলে ও বলে, এখানে একটা কচ্ছপ লুকিয়ে আছে। পাশের আর একটা ঢিপির ওপর থেকে শিক ঢুকিয়ে গুতো দিলে খচ্‌খচ্ শব্দ হয়। বলে এখানে ডিম পেড়ে রেখেছে। সত্যি ঢিপিগুলো কোদাল দিয়ে খুঁড়ে ফুলবাসী কচ্ছপ ও কচ্ছপের ডিম বের করল।

প্রতি বছর ডিমপাড়ার মরশুম আরম্ভ হলে সামুদ্রিক কচ্ছপেরা ভারত মহাসাগরের দ্বীপগুলোর উপকূলে চলে আসে ডিম পাড়তে। আমাদের সুন্দরবনেও কয়েক জাতের সামুদ্রিক কচ্ছপ চলে আসে। বাংলাদেশেও যায়। সাধারণতঃ চার জাতের কচ্ছপ সুন্দরবনে আসতে দেখা যায়। অলিভ রিডলে (Olive Loggerhead) সবুজ কচ্ছপ অর্থাৎ (Green Turtle) হকস্‌বিল কচ্ছপ (Hawksbill Turtle) খয়েরী রংয়ের কচ্ছপ (Brown Red Loggerhead Turtle)। আর এক জাতের কচ্ছপ আগে আসতো এখন আর দেখি না। তাদের নাম (Leather back) লেদার ব্যাক কচ্ছপ। 24 পরগনা, খুলনা, বরিশালের সমুদ্রোপকূলে প্রতি বছর হাজারে হাজারে লাখে লাখে অলিভ রিডলে কচ্ছপ আসে। তাদের অধিকাংশই মানুষের হাতে ধরা পড়ে এবং মারা পড়ে। ঐ সাথে অন্যান্য জাতের কচ্ছপরাও আসে তারাও মারা পড়ে। লেদারব্যাক কচ্ছপরা আগে পৃথিবীর সমুদ্রে প্রচুর সংখ্যায় ছিল। কিন্তু কয়েক বৎসর যাবৎ ওদের আর বিশেষ কারও নজরে পড়ছে না, আন্তর্জাতিক বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সংস্থা তাই এই জাতের কচ্ছপদের "বিরল প্রাণী" বলে ঘোষণা করেছেন। এবং সব দেশেই এই জাতের কচ্ছপদের হত্যা করা নিষিদ্ধ। আমাদের সুন্দরবন এলাকায় পাখির-আলয় অলিভ রিডলে কচ্ছপদের নিয়ে গবেষণা চলছে, ওদের ডিম সংগ্রহ করে কৃত্রিম উপায়ে বাচ্চা তুলে বড় করে আবার সমুদ্রে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছে। ঐ সাথে অন্যান্য আরও অনেক জাতের কচ্ছপদেরও বংশ বৃদ্ধি করার ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।

পৃথিবীর অনেক দেশে কচ্ছপের মাংসের প্রতি মানুষের লোভ আছে, শ্রীলঙ্কার জাফনা এলাকায় জেলেরা সমুদ্রে মাছ ধরার সময় জালে আটক করে হাজার হাজার কচ্ছপ ধরে এবং বাজারে বিক্রী করে। ইন্দোনেশিয়ার জাভার পূর্ব উপকূলে মধ্যে মধ্যে লেদারব্যাক কচ্ছপদের দেখা যায়। আন্তর্জাতিক আইন হওয়ার জন্য তাদের হত্যা করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা সারা জীবন সমুদ্রে কাটায়, কেবলমাত্র ডিমপাড়ার সময় হলে তীরে ফিরে আসে, তারা সেইখানেই আসে যেখানে তারা জন্মেছে। মেয়ে কচ্ছপ ডিম পাড়ার সময় হলে তীরে এসে ডাঙ্গায় উঠে পড়ে এবং এমন একটা স্থান নির্বাচন করে যেখানে জোয়ারের জল ওঠে না। সেখানে সে একটা গর্ত করে এবং তার মধ্যে স্তরে স্তরে সাজিয়ে ডিম পাড়ে। ডিমপাড়া হয়ে গেলে গর্ত বুজিয়ে ওপরটা ভাল করে লেপে দেয়। আর একটু ওপরে উঠে আর একটা গর্ত করে এবং নিজে তার মধ্যে ঢুকে গর্তটা বুজিয়ে দেয়। এইভাবে পঞ্চাশ দিন ধরে মাদি-কচ্ছপ অপেক্ষা করে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হবার সময় হলে মাদি-কচ্ছপ গর্ত ঠেলে উঠে আসে এবং ডিমের গর্ত থেকে বাচ্চাদের বের হতে সাহায্য করে। ডিম থেকে বেরিয়ে কচি বাচ্চারা যদি কাক, চিল, শকুন ও বাজপাখিদের চোখ এড়িয়ে গড়াতে গড়াতে কোনরকমে জলে পড়ল সেখানে তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, পাঙাস, কানমাগুর ও কামটের বাচ্চারা। এই সমস্ত শত্রুর হাত এড়িয়ে যদি কচ্ছপ শিশু গভীর জলে পড়ল তবেই তারা বাঁচোয়া।

সন্দেশখালি। 24 পরগনা (দঃ)

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

তোরা হঠাৎ কোত্থেকে? এতদিন বাদে মনে পড়লো!
মনে পড়লো বলেই তো বন্ধুকে নিয়ে সটান এখানে চলে এলাম।
খুব ভালো করেছিস। আয় ঘরে আয়, বোস।
হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হেঁটে টায়ার্ড হয়ে গেছি।
আমিও!
আহা, বোস এখানে, একটু জিরিয়ে নে।
কি রে চাঁদু, কি বলেছিলুম!
সত্যি এরকম অতিথি-বৎসল লোক আমি কোথাও দেখিনি!
ঐ এসে গেছে!
নে ধর। খেয়ে একটু ঠাণ্ডা হ, আমি এখুনি আসছি।
একি রে—এযে শুধু গ্লাস ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল!
আঃ, শুনলি না বললো—এখুনি আসছি? এর মানে অতি সহজ।

কই রে, মিনিট কুড়ি তো হয়ে গেল। তোর মেজকার এখনও আসার নাম নেই!
তা—ভাল মন্দ আনতে একটু দেরী হবে না?
ঐ তো এসে গেছে!
প্লেট কই? হাতে গামছা!
সরি, তোদের অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি! আমি গা-টা একটু ধুয়ে এলুম।
ওকি তোরা জলটা খেলি না!
অ্যাঁ—হ্যাঁ, খাবো!
ইয়ে—মানে প-প-প্লেট একটা—
প্লেট! এ তো গরম কিছু নয় যে প্লেটে ঢেলে ঠাণ্ডা করে খাবি! এ হলো ফিল্‌টার্ড ওয়াটার।
SEPT.'87
আমার লেবরেটরীতে তৈরী। যত খাবি তত ভাল থাকবি। শরীর মন তো ঠাণ্ডা হবেই, সেই সঙ্গে রোগ প্রতিরোধ এবং নিরাময়ও করবে।
মেজকা— শুধুই জল?
হ্যাঁ, শুধুই জল। সেই জল যদি পরিষ্কৃত হয় দেখবি সাধারণ কোন রোগের জন্য ডাক্তারের কাছে ছুটতে হবে না। জল বেশী খেতে হবে।
আ-আমি বলছিলুম— জলের সঙ্গে যদি—

সঙ্গে কিছু থাকা মানেই অপরিশুদ্ধ। আন্ত্রিক তো এখন একটা কমন ডিজিজ। এতে দেহস্থ জলীয় পদার্থের সঙ্গে সোডিয়াম পটাসিয়াম ক্যালসিয়াম ইত্যাদি ক্ষরণ হয়। এতে রক্তে প্লাজমার পরিমাণ কমে গিয়ে রক্তের ঘনত্ব বেড়ে যায়, ফলে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়, ফলে রুগীর প্রাণ সংশয় হয়ে উঠতে পারে।
এই সময় প্রচুর জল খাওয়া প্রয়োজন। জল সর্বদা ফুটিয়ে খাবি।
কি-কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে—!
মেজকা দেখছি জলে জলে করে জ্বালিয়ে মারলে!
না-না তোদের কেন! আমি বলছি রুগীদের ক্ষেত্রে। এই জলের সঙ্গে গ্লুকোজ নুন খাবার সোডা আর পটাসিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে খাওয়ানোই ভাল।
মেজকা আমরা রুগী নই! আর লিকুইড-এর চেয়ে সলিডই বেশী পছন্দ করি।
ইচ্ছে করছে মাথাটা নুন জলে চুবিয়ে ধরি!
রুগী লোক, হতে কতক্ষণ। আগে থেকে জানা থাকলে ততটা ভয় থাকে না। ধর খুব জ্বর হলো, মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢাল—তাপমাত্রা কমে যাবে। প্রচণ্ড কাশি, গলায় প্রদাহ, উষ্ণ নুন জল দিয়ে গার্গল, চোখে কনজাংটিভাইটিস—স্রেফ গরম নুন জলের ঝাপটা—অল ক্লিয়ার।
জলের পরিবর্তে অন্য কিছু ভাবা যায় না মেজকা?
হ্যাঁ—গরম জলের ভাপ নেওয়া যেতে পারে এতে নাক গলা, শ্বাসনালী ফুসফুসের প্রদাহ ও শ্বাসকষ্ট দূর করে।
আমরা তোমার মত জলজ প্রাণী নই বুঝলে!
জলের ভাপ আপনার মগজে ঢুকে দিন!
ঝন-ন-নঃ ঝন-নঃ
বুঝতে পারছি না—ওদের হঠাৎ এরকম বিহেবিয়ারের মানে কি!

মহাকাশের আর এক বিস্ময়—উল্কা

মৃন্ময়ী দাস

অস্ট্রেলিয়ার একটি ছোট শহর মুরাচিনশন্। সময়টা ছিল 1969 সালের 28শে সেপ্টেম্বর। সূর্য ওঠার আগেই ভোরের আকাশ হঠাৎ এক উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল। প্রায় এক মিনিট ধরে সেই আলোর ফোয়ারার সঙ্গে শোনা গেল অজস্র বাজি ফোটানোর মত প্রচণ্ড শব্দ। বাজি নয়, মুরচিনশন্ শহর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে প্রায় সাত মাইল লম্বা এবং দুমাইল চওড়া জায়গা জুড়ে সেদিন উল্কার হাজার হাজার ছোটবড় টুকরো ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় 82·7 কিলোগ্রাম উল্কার টুকরো জড় করা হয় সেদিন শহর থেকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর নাম দেন 'মুরচিনশন্ উল্কা'—সাম্প্রতিককালের একটি বড় রকমের উল্কাপাতের ঘটনা এটি।

উল্কার সূতিকাগার মহাকাশ। কিছু কিছু উল্কাকে জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসতে দেখা যায়। এদের এক একটির ওজন কয়েক আউন্স থেকে কয়েক টন্, এমনকি 100 টন পর্যন্ত হতে পারে। রাসায়নিক উপাদান অনুযায়ী উল্কাকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। সিডেরাইট্ বা লোহজাত ধাতব উল্কা যা তৈরি হয় লোহা ও নিকেলের ধাতুসংকর দিয়ে, অ্যারোলাইট বা পাথুরে উল্কা, যার মধ্যে নানান রকমের ধাতুর সিলিকেট ও অক্সাইড এবং সামান্য পরিমাণ লোহা থাকে। তৃতীয় প্রকার উল্কা হল সিডেরোলাইট্ বা মিশ্র উল্কা, এরা তৈরি হয় প্রথম দুরকম উল্কার অর্থাৎ ধাতব ও পাথুরে উল্কার সমাবেশে। মুরচিনশন্ উল্কার রাসায়নিক বিশ্লেষণে ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সিলিকেট্ ও কার্বন পরমাণু পাওয়া গেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় 460 কোটি বছর আগে। তাঁদের ধারণা, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যবর্তী স্থানে যে 'অ্যাসটরয়েড বেল্ট' বা গ্রহাণুবন্ধনী আছে তার মধ্যে সঞ্চরণশীল বস্তুকণা সন্নিবিষ্ট হয়ে অসংখ্য উল্কাপিণ্ড তৈরি করে। উল্কাপিণ্ডগুলির মধ্যে থাকে নানান রকমের তেজস্ক্রিয় পদার্থ, যাদের মধ্যে পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলে প্রচণ্ড উত্তাপ সৃষ্টি হওয়ায় উল্কাগুলি বিগলিত হয়। এর পরবর্তী কয়েক কোটি বছরে এই উল্কাপিণ্ডগুলি শীতল হয়ে কঠিন প্রস্তর-পিণ্ডে পরিণত হয়। এরা নির্দিষ্ট পথে সূর্যকে পরিক্রমণ করতে থাকে। পরিক্রমণকালে এদের মধ্যে কিছু কিছু পারস্পরিক সংঘর্ষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে যায়। এইসব টুকরোর কোনও কোনওটি কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে চলে আসে। সেই সময়ে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সঙ্গে ঘর্ষণের ফলে এরা প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত হয়ে যায় এবং এদের জ্বলন্ত আগুনের গোলার মত দেখায়। ছোট ছোট উল্কাপিণ্ডগুলি পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে। বড় উল্কাপিণ্ডগুলি পড়ার সময় বিস্ফোরণ ঘটায় বাজ পড়ার মত শব্দ হয় এবং মাটিতে অনেক সময় বিরাট গর্তের সৃষ্টি হয়। প্রতিদিনই কয়েক লক্ষ উল্কা পৃথিবীর পরিমণ্ডলীতে প্রবেশ করে এবং কয়েক টন উল্কাজাত বস্তু পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়ে। উল্কার মধ্যে যে সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ থাকে, যেমন 40 ভরযুক্ত পটাসিয়াম—40, 87 ভরযুক্ত রুবিডিয়াম—87 ইত্যাদি, তাদের তেজস্ক্রিয় ক্ষরণের হার মেপে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা উল্কার বয়স নির্ধারণ করেন। তাঁদের মতে সাধারণ যে সব উল্কা প্রতিদিন পৃথিবীতে বর্ষিত হচ্ছে তাদের বয়স প্রায় 450 থেকে 460 কোটি বছরের মধ্যে।

কেবলমাত্র অজৈব পদার্থই নয়, উল্কার মধ্যে জৈব রাসায়নিক পদার্থও পাওয়া গেছে। 1835 সালে দক্ষিণ ফ্রান্সের আলেস্ অঞ্চলে ভূতাত্ত্বিকেরা বিরাট এক উল্কাপিণ্ড আবিষ্কার করেন যার মধ্যে পৃথিবীর পাথরে যা যা উপাদান পাওয় যায় তার প্রায় সবই বর্তমান দেখা যায়। এছাড়া জীবকোষের প্রধান উপাদান কার্বন ও হাইড্রোজেনে তৈরি যৌগ হাইড্রোকার্বনও পাওয়া যায়। মুরচিনশন্ উল্কা ও অন্য অনেক উল্কাপিণ্ডে হাইড্রোকার্বন ছাড়াও আরও অন্য প্রকার জৈব যৌগ যেমন, কার্বোক্সিলিক অ্যাসিড, অ্যামাইনো অ্যাসিড, ফেনল্, অ্যালকোহল, বিভিন্ন প্রকার শর্করা, পিউরিন, পিরামিডিন প্রভৃতি পাওয়া গেছে। 1964 সালে সংগৃহীত এক ধরনের উল্কায় গোয়ানিন ও অ্যাডেনিন নামে দুরকমের জৈব যৌগ পাওয়া গেছে যা জীবনসৃষ্টির আদিম অণু 'ডি. এন্. এ' এবং 'আর্. এন্. এ'র অন্যতম মূল উপাদান। উল্কাপিণ্ডে আইসোপ্রেনয়েড হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায় যা শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। এই সব যৌগের অনেকগুলিই জটিল পদ্ধতিতে প্রাকৃতিক নিয়মে জীবদেহে তৈরি হয়, কৃত্রিম উপায়ে এদের

তৈরি করা সম্ভব হয় নি। উল্কাপিণ্ডের উপাদান বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা মনে করেন জীবনের আদিম অণুর সৃষ্টি মহাকাশেই হয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে পাওয়া কিছু কিছু উল্কা জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও ভূতাত্ত্বিকদের বিশেষ চিন্তায় ফেলেছে। যেমন দুই বিরল শ্রেণীর উল্কা, যাদের নাম বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন। শেরগোট্টাইটস্ ও নাখলাইটস্। এই দুই শ্রেণীর উল্কার বয়স মেপে দেখা গেছে প্রায় 62 থেকে 20 কোটি বছরের মধ্যে অর্থাৎ এরা বয়সে নবীন এবং এরা তৈরি হয়েছে গলিত লাভা শিলীভূত হয়ে।

কোনও কোনও বিজ্ঞানীর ধারণা এই সব উল্কার উৎপত্তিস্থল মঙ্গলগ্রহ। হয়তো কোনও বিরাট গ্রহাণুর সঙ্গে সংঘর্ষে মঙ্গলের ভূত্বকের শিলা ভেঙে যায়। এদের প্রচণ্ড গতিশক্তি উত্তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে টুকরোগুলিকে বিগলিত করে। বিগলিত টুকরোগুলি মঙ্গলের পরিমণ্ডলী থেকে বেরিয়ে এসে মহাকাশে বিচরণ করতে থাকে এবং আস্তে আস্তে ঠাণ্ডা হয়ে শিলীভূত হয়। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলের দ্বারা ধরা পড়লে তারা পৃথিবীর বুকেই ঝরে পড়ে। এই উল্কার টুকরোগুলি চাঁদের শিলীভূত গলিত লাভা নয়, কেননা মহাকাশচারীদের সংগৃহীত চাঁদের প্রস্তরের নমুনায় দেখা গেছে তাদের বয়স প্রায় 250 কোটি বছর এবং চরিত্রও ভিন্ন। তাছাড়া মঙ্গলের মুক্তিবেগ বা 'এসকেপ ভেলসিটি' অনেক কম, সেকেণ্ডে 3·2 মাইল, তাই মঙ্গলের পরিমণ্ডল থেকে টুকরোগুলি অপেক্ষাকৃত সহজেই মহাকাশে বেরিয়ে আসতে পারে। শুক্র বা পৃথিবীর ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয় কেননা এই দুই গ্রহের 'এসকেপ্ ভেলসিটি' অনেক বেশি।

1982 সালে কুমেরুর গভীর বরফস্তরের মধ্যে 31 গ্রাম ওজনের ১ সেণ্টিমিটার ব্যাসসম্পন্ন একটি উল্কার সন্ধান পাওয়া গেছে। বরফের মধ্যে চাপা পড়ে থাকায় এই উল্কার মধ্যে ভূপতিত হবার পর কোনও পরিবর্তন হয় নি। বিজ্ঞানীদের মতে এই টুকরোটি চাঁদ থেকে এসেছে, কেননা অ্যাপলোর মহাকাশচারীদের আনা চাঁদের পাথরের নমুনার সঙ্গে এর খুবই মিল। চাঁদের মাটির মত উল্কাটির বাইরের অংশ মসৃণ এবং কাঁচের মত। চাঁদের পাথরের মতই এর উপাদানের 75 শতাংশ ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট, যা একমাত্র চাঁদের পাথরেই পাওয়া গেছে। লোহা ও ম্যাঙ্গানিজের পরিমাণের অনুপাত এবং অক্সিজেন, হিলিয়াম ও আরগন গ্যাসের প্রাচুর্যও চাঁদের শিলারই মত। বিজ্ঞানীরা উল্কাটির নাম রেখেছেন 'ALHA 81005'। কিন্তু কি করে এটি পৃথিবীর বুকে এল এটা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও একটি বিস্ময়।

মুক্তিবেগ (Escape Velocity)

গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতির মাধ্যাকর্ষণ টান উপেক্ষা করে তাদের পরিমণ্ডল থেকে বহির্মহাকাশে বেরিয়ে যাওয়ার জন্য কোনও বস্তুর ন্যূনপক্ষে যে বেগ লাভ করতে হয় সেই বেগকে বলা হয় মুক্তিবেগ। যেমন পৃথিবীর ক্ষেত্রে এই বেগ সেকেণ্ডে 6·96 মাইল, বুধের 2·6 মাইল, শুক্রের 6·4 মাইল, মঙ্গলের 3·2 মাইল, বৃহস্পতির 37·9 মাইল, শনির 23·00 মাইল।

ব্রহ্মাণ্ডের শেষ কোথায় শংকর ঘটক

দুটো প্রশ্ন যুগ যুগান্ত ধরে মানুষের মাথার ভেতর বাসা বেঁধে আছে।

এক ঃ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড জগতের শেষ কোথায় ?

দুই ঃ পৃথিবী ছাড়া অন্য কোথাও প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি ? থাকলে তারা কেমন ?

এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কত মানুষ নিঃস্ব হয়েছেন। কত মানুষ মারা গেছেন। হয়ত বহু মানুষ উন্মাদ হয়ে গেছেন। মানুষের জন্ম থেকেই এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা শুরু, এখনো শেষ হয় নি সেই কাজ। চলবে আরো কতদিন কে জানে! অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার রাত্রে, খোলা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে আকাশের দিকে তাকালে কত অপূর্ব দৃশ্যই না আমাদের চোখে ভাসে। স্থির হয়ে চলছে কিছু বিন্দু, আর কিছু বিন্দু চিক্‌মিক্ করছে। কিছু তারা উজ্জ্বল, কিছু তারা নিষ্প্রভ। খালি চোখে পরিষ্কার আকাশের দিকে তাকালে আমরা দেখি মোটামুটি 4000 তারা। আর 6 মিটার টেলিস্কোপে চোখ রেখে আকাশের দিকে তাকালে কি দেখব ? অন্ততঃ 2000 কোটি চলন্ত বিন্দু দেখতে পাবো আকাশে। যদি আরো শক্তিশালী টেলিস্কোপে চোখ রাখি তবে ? এর শেষ কোথায় ?

শুধু আমাদের গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ, সূর্যকে নিয়ে সৌর পরিবার যার সদস্য, শুধু সেখানেই নাকি আছে 20,000 কোটি নক্ষত্র। এদের দেখা, এদের জানা, এদের মাপা—এসব কাজ সোজা নয়। বিশাল বিশাল নক্ষত্ররা বিশাল বিশাল দূরত্বে অবস্থান করছে এদের মাপজোকের অঙ্কগুলোও তাই হবে বিশাল বিশাল। কেমন হবে সেইসব হিসেব ?

কয়েকটি মাপ জোক ঃ যদি প্রশ্ন করি হাওড়া থেকে আসানসোলের দূরত্ব কত? উত্তর হওয়া উচিত 200 কিলোমিটার। কিন্তু কেউ যদি বলে 20,00,00,000 মিলিমিটার তাহলে সেই উত্তরকে ভুল বলা না গেলেও গ্রহণ করা যাবে না। অযথা কতগুলো শূন্য দিয়ে মাপজোকের অসুবিধা ঘটানোর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হবে সে। কিলোমিটার এককটিই সঠিক এক্ষেত্রে। এই এককে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত? 14,95,00,000 কিলোমিটার। এটাও একটা বিরাট সংখ্যা। সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি স্থির এটা ধরে নিয়ে বিজ্ঞানীরা এই দূরত্বটিকেই একটি একক বানিয়ে ফেল্লেন—"জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক (A.U.)"। অর্থাৎ,

1 A.U = 14,95,00,000 K.M.

এই এককে সূর্য থেকে বুধের দূরত্ব 0·387 A.U. সূর্য থেকে শনির দূরত্ব 9·54 A.U.

আমাদের সূর্যের নিকটতম আরেকটি সূর্যের নাম প্রক্সিমা। সূর্য থেকে প্রক্সিমার দূরত্ব 2,60,000 A U.। কি বিপদ! আবার সংখ্যা যাচ্ছে বেড়ে। এই অসুবিধা থেকে জন্ম নিল আরেকটি একক 'আলোক বর্ষ"। এক সেকেণ্ডে একটি আলোকরশ্মি 3,00,000 কিঃ মিঃ অতিক্রম করে। অতএব বছরে অতিক্রম করে $3,00,000 \times 60 \times 60 \times 24 \times 365 = 9^{1},60,00,00,00,000$ কিঃ মিঃ। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৪ মিনিট। এই বিশাল অঙ্কের এককটিও কি যথেষ্ট? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিশালত্বের তুলনায় এই এককটিও অতি ক্ষুদ্র।

পৃথিবীকে কেন্দ্রে রেখে নিকটতম 15টি নক্ষত্রের দূরত্ব দেওয়া হল।

নক্ষত্র	আলোকবর্ষে দূরত্ব
সূর্য	(আট মিনিট)
প্রক্সিমা সেণ্টুরি	4·2
α-সেণ্টুরি A	4·3
α-সেণ্টুরি B	4·3
লুইটেন 726-8	5·8
বার্নার্ড স্টার	6·0
উল্ফ-359	8·1
সাইরাস-A	8·6
সাইরাস-B	8·6
রোস-154	9·3
লুইটেন 789-6	9·9
রোস 248	10·4
এপসাইলন এরিভানি	10·8
ট্যানসেটি	11·0
61 সিগনি-A	11·0
61 সিগনি-B	11·0

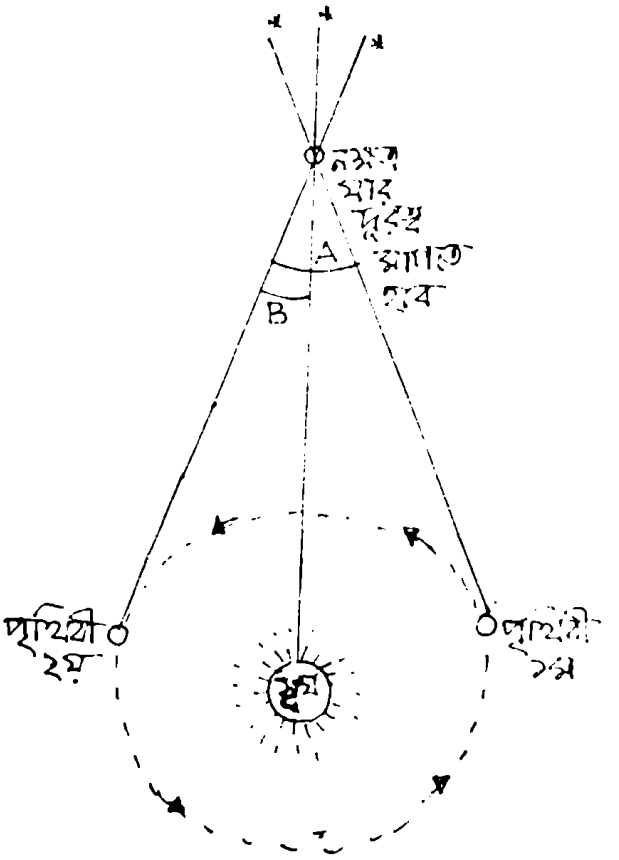

আমরা যে ছায়াপথে অবস্থান করি (মিল্কি ওয়ে) তার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব ১ লক্ষ আলোকবর্ষ।

আর দূরের কথা? সিগনাস ছায়াপথের দূরত্ব 70 কোটি আলোক বর্ষ। অর্থাৎ সিগনাস ছায়াপথ থেকে একটি আলোক রশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছুতে সময় নেবে 70 কোটি বছর। অতএব আলোকবর্ষটাও ছোট একক হয়ে গেল। আবার এককের সন্ধান!

পারসেক ঃ পৃথিবী সূর্যকে প্রায় বৃত্তাকার একটি উপবৃত্ত পথে প্রদক্ষিণ করে। যদি পথটিকে হিসেবের সুবিধার জন্য বৃত্ত ধরে নি, তবে সেই বৃত্তটির ব্যাস হবে 29·76 কোটি কিলোমিটার। একটি নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষ একটি নক্ষত্রের অবস্থান নির্ণয় করা হল (১ম অবস্থানে পৃথিবী)। ঠিক ছ মাস পরে আবার সেই নক্ষত্রটির অবস্থান নির্ণয় করা হল (2য় অবস্থানে পৃথিবী)। এবারে যে কোণটি তৈরি হল (কোণ A) তা পরিমাপ করা হল। A কোণের অর্ধেক (কোণ B) কে বলে নক্ষত্রটির প্যারালাক্স (parallax)। ত্রিকোণমিতির নিয়ম প্রয়োগ করে পৃথিবী থেকে নক্ষত্রটির দূরত্ব এবার সহজেই মাপা যাবে।

পারসেক শব্দটি এসেছে প্যারালাক্স এবং সেকেণ্ড এই দুটি শব্দের সন্ধি করে (PARallax + SECond)।

কেন্দ্রীয় কাচ ও সেরামিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, যাদবপুর।

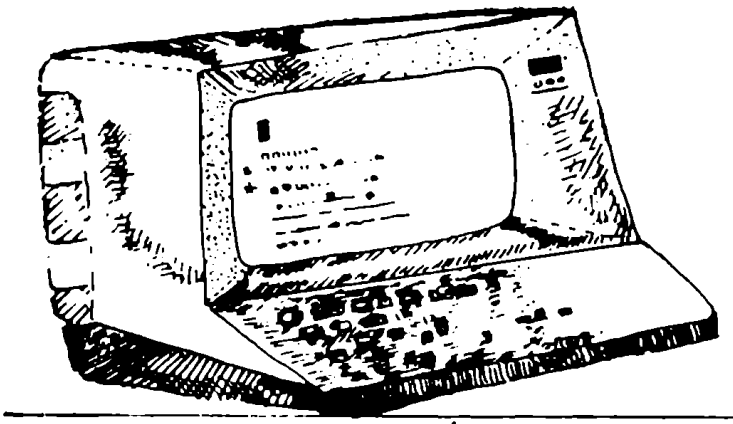

কম্পিউটার

শুভাশিস আতর্থী

আধুনিক যে যন্ত্রগণক, যাকে বলা হয় ইলেকট্রনিক কম্পিউটার। তার জন্ম হয় 1943 সালে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মার্কিন গোলন্দাজ বাহিনীর প্রয়োজনে। 1946 সালের মধ্যেই সেই শিশু কম্পিউটার সেকেণ্ডে 4,500টি যোগ করার ক্ষমতা অর্জন করে। সেই শিশু কম্পিউটার আজ তার যৌবনগর্বে দীপ্ত।

যে কোন কম্পিউটারের প্রধান কাজ হ'ল খুব দ্রুত এবং নির্ভুলভাবে অঙ্ক কষা। কিন্তু প্রতিবারই অঙ্ক কষার সময় যদি কম্পিউটারকে বাইরের নির্দেশ দিতে হয় তবে কাজ তাড়াতাড়ি চলবে কি করে? তাই অফিসের কর্মচারীর মত কম্পিউটারেরও একটি স্মৃতিভাণ্ডার আছে—যাকে বলা হয় কম্পিউটারের মেমরি (স্মৃতি) বা স্টোরেজ, অর্থাৎ যেখানে তথ্যগুলো—যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ডেটা, জমা করে রাখা হয়। ডেটা ছাড়াও দু'রকম খবর জমা থাকে এখানে। তাদের বলা হয় সংখ্যাবলী বা এরিথমেটিক (পাটিগণিত) ইউনিট এবং অঙ্ক কষার পরে উত্তর এবং পরবর্তী কর্মসূচীর নির্দেশ (যাকে বলা হয় প্রোগ্রাম)।

কম্পিউটারের বিভিন্ন অংশে খবর এবং নির্দেশ আদান-প্রদানের জন্য 'কনট্রোল' নামে এক বৈদ্যুতিক জাল বিছানো থাকে। এর কাজ হ'ল কম্পিউটারকে যে ভাষায় কথা বলা হয় তার অর্থ উদ্ধার করে বৈদ্যুতিক ভাষায় তাকে নিয়ে যাওয়া, যাতে অন্যান্য অংশগুলি থেকে যথাযথ খবর এসে পেঁছিয় তার খবরদারি করা এবং উত্তর তৈরি হবার পর সেগুলিকে যথাস্থানে পেঁছে দেওয়া। কণ্ট্রোল যে ক'টি অংশের ওপর প্রভাব রাখে তা (চিত্র নং—1) ছবিতে ভগ্ন রেখা দিয়ে দেখান হয়েছে।

কম্পিউটার চালাবার প্রধান কর্মকর্তাকে বলা হয় প্রোগ্রামার। প্রোগ্রামারকেই ঠিক করতে হবে প্রবলেম (সমস্যা) বা অঙ্কটিকে কি ভাবে গুছিয়ে নিতে হবে এবং কিভাবে তথ্যগুলি সাজিয়ে নিয়ে কম্পিউটারে দিতে হবে (চিত্র নং—2) তথ্যগুলি টাইপরাইটার জাতীয় একটি যন্ত্রে ফেলে সেটিকে একটি দ্রুত চলন্ত চৌম্বক ফিতের ওপর ম্যাগনেটিক বিট্-এ (বাংলায় চৌম্বক আঘাত বলা যেতে পারে) রূপান্তরিত করে দেওয়া হয়। ফিতে খুললেই এই বিট্গুলো আর একটি যন্ত্রে এসে বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা পাল্স্ জাগাতে সুরু করে। এই স্পন্দন বিট্গুলোর সঙ্গে ঠিক ঠিক সামঞ্জস্য রেখে তৈরি হয়—অর্থাৎ বলা যেতে পারে ঠিক যেন ওকে বিদ্যুতের ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে। এর পরই ঐ স্পন্দন আসল কম্পিউটার যন্ত্রে গিয়ে ঢোকে যেখানে আছে স্টোরেজ বা মেমারি, যাকে আমরা কম্পিউটারের স্মৃতিভাণ্ডার বলছি, এরিথমেটিক (পাটী-গণিত) এবং কণ্ট্রোল। এখানেই অঙ্ক বা প্রবলেমটা সত্যিকারে কষা হয়ে যায় (চিত্র নং—2)।

কম্পিউটার থেকে উত্তরটা বেরিয়ে আসে ঐ বৈদ্যুতিক স্পন্দন বা পাল্সের আকারে। কাজেই সেটাকে আবার নিয়ে আসা হয় আগের মত আর একটি যন্ত্রে, সেখানে সেগুলি আবার বিট্-এ রূপান্তরিত হয়ে আর একটা ম্যাগনেটিক টেপ (চিত্র নং—2) বা চৌম্বক ফিতের ওপর এসে পড়ে। এবার ঐ ফিতে থেকে তাকে সহজবোধ্য ভাষায় নিয়ে আসা হয়। তথ্য (ইন্পুট) ঢোকাবার সময় যে রকম টাইপরাইটার জাতীয় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল উত্তর (আউটপুট) বার করে আনবার সময়ও সাধারণতঃ সেইরকম একটা টাইপরাইটার জাতীয় যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া হয়।

ম্যাগনেটিক টেপের (চৌম্বক ফিতে) বদলে ছিদ্রযুক্ত শক্ত কাগজের যাকে বলা হয় 'পাঞ্চড্ কার্ড' (চিত্র নং—3) সাহায্য নিয়েও কম্পিউটারে নির্দেশ দেওয়া যায়। ঐ ফুটোগুলোর অবস্থানের ওপর কম্পিউটার নির্দেশ গ্রহণ

[শেষাংশ 42 পৃষ্ঠায়]

রোজ রোজ "রতাই" রাত্রিবেলা আকাশের দিকে চেয়ে বসে থাকে। ঐ যে সব আকাশ ভরা রুপোলী নক্ষত্র ওদের বিচিত্র ভাষা—বুঝে উঠতে পারে না শুধু তাকিয়ে থাকে।

সেই ছোট্টবেলা থেকে বাবার কাছে ফরেস্ট অফিসে বড় হয়েছে। একটু দুরন্তও বটে। জঙ্গলের পশু পাখিদের সঙ্গে বড্ড বন্ধুত্ব—ডোডো পাখির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল করেক বছর আগে। বাড়ির পাশেই একটা নদী রয়েছে। নদীটার পার ধরে ছুটির দিনে সকাল বেলায় দুজনে খেলতে যায়। ডোডো ডানা মেলে উড়ু উড়ু খেলা খেলে। আর রতাই তাকে অনুসরণ করে। এভাবে দুজনে মাতামাতি করে, খেলতে খেলতে রতাই-এর আকাশে ওড়ার বাসনা জাগে।

এমনি এক ছুটির দিন সকালে দুজনে খেলতে বেরিয়েছে। ঘরের কাছ থেকে অনেকটা এগিয়ে সেই

নদী তীরে আসে। যেতে যেতে রতাই দেখতে পেলো নদীর পারে গোল গম্বুজাকৃতি একটা ঘর ছোট ছোট তিনটে পায়ে দাঁড়িয়ে। এমন আশ্চর্য জিনিস এর আগে রতাই দেখেনি। চকচকে ধাতুর তৈরি মাথার ওপরে দুটো লম্বা অ্যান্টেনা। রতাই এর মনে এক বিস্ময়ের দানা জমাট বাঁধলো। পাশে দেখতে পেলো একটা দরজা খোলা রয়েছে। ডোডো উড়ে গিয়ে দরজার ওপরে বসলো। রতাই তখন ডোডোকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। ঢুকেই দেখতে পেলো চারিদিকে ছোট ছোট কত রকমের যন্ত্রে ভর্তি। সামনেই একটা ধাতুর চেয়ার। তার পাশে একটা স্বচ্ছ দরজার আড়ালে বসে এক কিম্ভূৎ-কিমাকার মূর্তি। রতাই-এর মাথা গোলমাল হয়ে গেল।

হঠাৎ একটা শব্দ। দেখলো ঐ মূর্তিটা নড়ছে। দরজাটা ধপ্ করে বন্ধ হয়ে গেল। রতাই ভয়ে ঘাবড়ে গেল। ডোডো ওড়বার চেষ্টা করল পারলো না। সামনে একটা ছোট্ট কাঁচের পর্দার মত বস্তুতে—লেখা ভেসে উঠল।

"ভয় পেয়ো না লক্ষ্মী ছেলে"—আসলে যন্ত্রটা ছিল সাইকো-ইকো-অ্যানালাইজার। ডোডো ভয়ে কেঁকে কেঁকে করতে যন্ত্রটা একটা শব্দ করে তার প্রতিভাষ তাকে জানিয়ে দিলো। ডোডো তখন চুপচাপ বসে রইল।

বিদ্ঘুটে মূর্তিটি খট্ করে একটা সুইচ্ টিপ্লো। অমনি গোল গম্বুজটা ঝাঁকুনি দিয়ে উপরের দিকে উঠতে লাগলো। রতাই দেখলো ঘর বাড়ি-বন-নদী সব মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে যন্ত্রটা আরো·· আরো···ওপরে উঠতে থাকলো। রতাই ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—"আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছো"—কাচের পর্দাতে দেখা গেল "এখন মঙ্গল গ্রহে যাচ্ছ„" পাশের মূর্তিটার দিকে তাকাতে দেখতে পেলো মূর্তিটা দুটি ধাতব হাতে কী সব করছে। বুঝতে পারলো ওটা একটা রোবট। আর এটা একটা মহাকাশযান। এ সব কিছু কিছু বিজ্ঞানের আর গল্পের বইতে পড়েছে। কিন্তু সত্যি সত্যি যে মহাকাশে পাড়ি দেবে রতাই ভাবতে পারে নি। ভয়মিশ্রিত মন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

রতাই জিজ্ঞেস করলো—"LV-707কে।

—পৃথিবীতে কেন এসেছিলে।

—নক্ষত্ররাজ ম্যাগনন আমাদের পাঠিয়েছে।

—কেন?

—বিভিন্ন গ্রহ নক্ষত্রের খবর নিতে।

—ম্যাগনন কোথায় থাকে।

—পৃথিবী থেকে একশ কোটি আলোকবর্ষ দূরে আনড্রোজোন্ গ্যালাক্সিতে।

রতাই ওপরে যেতে যেতে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। বাবা-মায়ের কথাও মনে পড়ছিল। ওপর থেকে পৃথিবী-কে নীল সবুজ সুন্দর দেখাচ্ছিল। ধীরে ধীরে পৃথিবী ছোট হতে থাকলো। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে মহাকাশযান LV-707 ছুটে চলেছে।

রতাই ডোডোকে কোলের উপর বসিয়ে নানা কথা বলতে থাকে। ডোডো কিছু বুঝুক বা না বুঝুক মাঝে মাঝে ডানা নাড়িয়ে সায় দিচ্ছিল। রতাই ভাবছে পৃথিবীর মানুষ জানতেই পারলো না যে এই প্রথম এরকম বিস্ময়কর মহাকাশ অভিযানে চলেছে এক ছোট ছেলে আর একটা পাখি। যেতে যেতে LV-707 ভূসমলয় কক্ষে এসে পৌঁছল। সেখানে আসতেই কতকগুলো ছবি পর্দায় দেখা গেল। আসলে ওগুলো হলো কৃত্রিম উপগ্রহ যেগুলো পৃথিবীর মানুষ পাঠিয়েছে। ইস্যাট তার হাতখানি মেলে আপন মনে ভেসে আছে মহাকাশের বুকে। রতাই ইস্যাট-এর নাম বহুবার শুনেছে। ছবিতেও দেখেছে তাই তাকে বুঝতে কোন অসুবিধে হয়নি। আরো কত বিচিত্র সব মহাকাশযান আকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পৃথিবীর চৌম্বকক্ষেত্র ছাড়িয়ে রুপোলী নক্ষত্র ভরা মহাকাশের মধ্যে LV-707 ছুটে চলেছে মঙ্গল গ্রহের দিকে। পৃথিবী থেকে মঙ্গল 46 কোটি মাইল দূরে রয়েছে। পৃথিবীকে ধোঁয়াটে দেখাচ্ছে। একটা রক্তিমাভা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। রতাই জিজ্ঞেস করল, ঐ লাল বস্তুটা কী? "ওটা মঙ্গল গ্রহ আমরা আর এক ঘণ্টার মধ্যে ওখানে পৌঁছে যাবো।" দেখতে দেখতে LV-707 মঙ্গল গ্রহের অনেক কাছে এলো। ক্রমশঃ লাল আভা মিলিয়ে যেতে যেতে একটা ধোঁয়াটে গ্যাসের আবরণ দেখা গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যে LV-707 মঙ্গলের মাধ্যাকর্ষণের মধ্যে প্রবেশ করল। ধোঁয়াটে গ্যাসের আবরণ ছাড়িয়ে মঙ্গলের ভূপৃষ্ঠ দেখা গেল। পৃথিবী থেকে মঙ্গলে মেরিনার ও ভাইকিং মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল।

মেরিনার মঙ্গলের খুব কাছ দিয়ে উড়ে গেছিল ভাইকিং কিন্তু নেমেছিল। ভাইকিং এর সময় লেগেছিল এগারো মাস।

নক্ষত্ররাজ ম্যাগনন এ সব খবর জানতো তাই সে ISA-001 বাহিনীকে মঙ্গলে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ইন্টারস্পেশ এজেন্সীর একজন হচ্ছে LV-707। কয়েক মিনিটের মধ্যে LV-707 এসে অবতরণ করলো মঙ্গলের মাটিতে। সময় লাগলো মাত্র তিন ঘণ্টা। রতাই দরজা খুলে নামবার চেষ্টা করলো কিন্তু পারলো না। তখন নিরুপায় হয়ে এদিক ওদিক করতে শোনা গেল—

"পাশের সবুজ রঙের বাক্সের মধ্যে স্পেশস্যুট রয়েছে।

ওটা পরলেই নামতে পারবে।" ঐ বাক্সটা থেকে স্পেশসুট বার করে গায়ে চড়িয়ে দিয়ে দরজায় টান দিতে দরজা খুলে গেল। ডোডোও তখন ছটফট করতে থাকলো নামবে বলে।' কিন্তু পারলো না পোশাক নেই বলে। পৃথিবীর পাখি মহাকাশে আসেনি কখনো। এদিকে রতাইকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য রোবটেরা এসে গেছে।

রতাই তাদের জানিয়ে দিলো "বন্ধুগণ সঙ্গে আরো একজন এসেছে সে সঙ্গে না থাকলে আমার পক্ষে নামা সম্ভব নয়।" রোবটেরা ভীষণ ফ্যাসাদে পড়ল। তারা তাদের কমান্ডারের কাছে লেসার তরঙ্গে খবর পাঠালো। তৎক্ষণাৎ একদল ইঞ্জিনিয়ার রোবট এসে হাজির হলো। তারা এসে ডোডোর শরীর অটো-ইলেকট্রো কম্পিউটারের সাহায্যে বিভিন্ন অংশের বিশ্লেষণ করে এক ঘন্টার মধ্যে ঠিক যুৎসই একটা স্পেশসুট বানিয়ে দিলো।

ডোডোকে সঙ্গে নিয়ে রতাই এবার নিচে নামলো।

রোবটেরা নিয়ে গেল এক বিরাট আকারের গম্বুজের মধ্যে। সেই গম্বুজটির চারিদিকে প্রচুর মহাকাশযান। ভেতরে থাকার জায়গা, গবেষণাগার। তাছাড়া বিভিন্ন রকমের ইলেকট্রনিক টেলিস্কোপ, অলোকালি, এক্সরে, রেডিও টেলিস্কোপও রয়েছে। লেসার বীম ও আলট্রা ভায়োলেট সংমিশ্রণে গঠিত নিজস্ব প্রতিবিম্বের মাধ্যমে ম্যাগনন মহাকাশের বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাফেরা করে। কমান্ডার ISA-001 ওদের অভ্যর্থনা জানালো। বিশ্রামের জন্যে দুজন রোবটের সঙ্গে রতাই ডোডোকে একটা ঘরে পাঠিয়ে দিলো। ঘরটা দেখতে ওল্টানো 'V'-এর মত। তার ওপরে হেভি মেটালের ছাউনি। ঘরে একটি মাত্র ইলেকট্রো-ম্যাগনেটিক দরজা। ওরা এসে একটা সুইচ টিপতে দরজাটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে দেখলো ঘরের ভেতরেই সব ব্যবস্থা রয়েছে। একটি অত্যাধুনিক ছিমছাম ঘর। সব কিছুই চলে সোলার পাওয়ার

একটি অত্যাধুনিক ছিমছাম ঘর।

সিস্টেমে। স্পেশস্যুট খুলে রেখে দুজনে খাওয়া দাওয়া সারলো। সুন্দর এক ফোমের বিছানায় রতাই শুয়ে পড়লো ডোডোকে নিয়ে। ভেতরে অক্সিজেনেটেড এয়ার। বাইরে রোবট দুটো RB-5 এবং RB-6 চুপচাপ দাঁড়িয়ে। ঠিক বিকেলে ঘুম ভাঙলো। রতাই RB-5-কে ভেতরে ডেকে বলল বেড়াতে যাবে। দুজনেই স্পেশস্যুট পরে তৈরি হয়ে নিল। রতাইয়ের কিন্তু এবার বাড়ির কথা মনে পড়ল। বাবা মা যদি সঙ্গে থাকতো তাহলে কী মজাটাই না হতো।

একটা স্বয়ংক্রিয় মোটরযানে চেপে RB-5 এর সঙ্গে চলল দুজনে। প্রচণ্ড উল্কাপাতে মাঝে মাঝে বিরাট গহ্বর। দূরে দূরে কিছু কিছু আগ্নেয়গিরির মুখ। বিরাট বিরাট সব শুকনো নদী। এখানে ওখানে বেশ কয়েকটি কারখানা। মঙ্গলের মাটিতে যে সব মূল্যবান ধাতু পাওয়া যায় সেগুলো নিষ্কাশনের ব্যবস্থা। এরকম একটি হল টাইটানিয়াম এক্সট্রাকশন প্ল্যান্ট। কয়েকটি রোবট পাথর কেটে কেটে ট্রলিতে ভরছে। সেগুলো রোপ-ওয়েতে করে কারখানার মধ্যে আনছে। তারপর পরিশুদ্ধ করে বিশুদ্ধ ধাতুর পাত তৈরি করছে।

রতাই RB-5 কে জিজ্ঞেস করলো। ঐ লাল মাটি-গুলো কী?

RB-5 : ওগুলো হচ্ছে ফেরো-অক্সাইড। এখানে বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম। সব-কার্বন-অক্সাইড নয়তো ফেরো-অক্সাইডে পরিণত হয়েছে। RB-5-এর বুকের উপর স্বচ্ছ ধাতুর পর্দার উপর কথাগুলো লেখা হচ্ছিল। এখানকার বায়ুমণ্ডলে প্রতি লিটারে এক ভাগ থাকে অক্সিজেন। তাই অক্সিজেন তৈরির জন্য একটা বড় কারখানা করা হয়েছে। কারখানার নাম হচ্ছে স্পেশ-অক্সিজেন লিমিটেড।

রতাই : ঐ বড় বড় পিরামিডের মত ঘরগুলো কীসের জন্য।

—ওগুলোর মধ্যে সব তরল অক্সিজেন জমা রাখা হয়।

—আরো কতগুলো কারখানা আছে?

— এখানে বিভিন্ন ধরনের দুশো প্ল্যান্ট হয়েছে।

—জীব জগতের কোন চিহ্ন তো এখানে নেই?

— নিশ্চয়ই আছে, গ্রীন-হাউসে আছে।

—ঐ কারখানা কী? ওতে জলীয় বাষ্প বেরুচ্ছে?

—ওটা, ওয়াটার সিন্থেসীস প্ল্যান্ট, এখানে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন সংযোগে জল তৈরি করা হয়। এর কিছু দূরে রয়েছে গ্রীন-হাউস সেখানে এবার যাবো।

কিছুক্ষণের মধ্যে ওখানে সবাই পৌঁছে গেলো। ভেতরে ঢুকে দেখলো বিভিন্ন নক্ষত্র জগতের জীবজন্তু গাছপালাতে সাজানো। ডোডো এসে কিছু কিছু আদিম পাখির সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেললো মনে হল যেন কতদিনের পুরনো বন্ধু। রতাই আপন মনে রোপ-ওয়েতে চেপে গাছগুলো ঘুরে ঘুরে দেখছিল। বিভিন্ন সৌরজগতের জীব, নানা প্রজাতির গাছ আলাদা আলাদা চেম্বারে রাখা আছে। নানা রকমের নানা রঙের ফুলের গাছ। "RB-5" বলল গ্রীন হাউসটি উচ্চতায় চারশ ফুট এবং কয়েক মাইল বিস্তৃত। আদিম গাছ-গুলোকে লেসার রশ্মির সাহায্যে যত্ন নেওয়া হয়।" এবার ওরা ফিরে চলল আগের জায়গায়। রাস্তায় আসতে আসতে রতাই দেখতে পেলো দূরে পাহাড় পর্বতগুলো সাদা বরফে ঢাকা। ওগুলো আসলে শুকনো বরফ। জলের পরিমাণ নেই বললে চলে।

রতাইকে RB-5 নিয়ে গেল গবেষণাগারে। সেখানে রসায়ন, পদার্থ জীবন আর মহাকাশ বিষয়ে গবেষণা করা হয়। মঙ্গলের কিছু অংশে রাসায়নিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে পৃথিবীর উপযুক্ত করে তৈরির চেষ্টাও হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের টেলিস্কোপ পরপর সাজানো রয়েছে। সব থেকে বড় টেলিস্কোপটির দৈর্ঘ্য 500 মিটার এবং ব্যাস 100 মিটার। ঐ দূরবীনের সাহায্যে আকাশের বিভিন্ন অংশের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় একটি স্বচ্ছ ধাতুর পর্দাতে। বিভিন্ন রকমের ধূমকেতু বিশেষ করে হ্যালির ধূমকেতুর কথা অনেক শুনেছে। গ্যালাক্সির কথাও শুনেছে। RB-5 রতাইকে ঐ দূরবীনটার সাহায্যে ওগুলো দেখিয়ে দিল। এ ছাড়াও বিভিন্ন গ্যালাক্সি, নিউট্রন নক্ষত্র শ্বেত-বামন, ব্ল্যাকহোল, নেবুলা, গ্রহাণু সোলার-নক্ষত্র আরো কত কী।

পরের দিন সকাল বেলায় সঙ্গে করে ওদের গম্বুজ দুর্গে নিয়ে এলো। ISA-001 ম্যাগননের পাঠানো একজোড়া ইলেকট্রনিক সাদা পায়রা উপহার দিল। রতাই ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলো LV-707 এর কাছে। একদল রোবট তাদের কনসার্টে এক মিষ্ট সুর তুলে পৃথিবীর মানুষকে বিদায় অভিনন্দন জানালো। রতাই ঐ পায়রা দুটো আর ডোডোকে সঙ্গে নিয়ে LV-707 এ এসে বসল। দুজনের স্পেশস্যুট দুটো খুলে বাক্সটার মধ্যে রাখল। কিছুক্ষণের মধ্যে LV-707 উড়ে চলল পৃথিবীর দিকে।

তারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করলো।

এদিকে রতাইয়ের বাবা মা খোঁজাখুঁজিতে ব্যস্ত। এমন সময় LV-707 হুশ করে নদীর পাড়ে এসে নামল। কয়েক মিনিটের মধ্যে তার ভেতর থেকে রতাই আর ডোডো সাদা পায়রা দুটো নিয়ে নিচে নেমে এলো। বাবা-মা ওদের ফিরে পেয়ে খুব খুশী। রতাই সব ঘটনা বললো। শুনে সবাই অবাক হয়ে মহাকাশ-যানটির দিকে তাকিয়ে থাকলো। অমনি LV-707 থির থির করতে করতে দুলতে দুলতে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। শুধু রেখে গেল একজোড়া সাদা পায়রা।

তেরো : চীনে পুতুলের রহস্য

আর কিছু বলেনি কর্নেলিয়াস। বলতেও চায় না। আমি কিন্তু বুঝেছি হেঁয়ালি সমাধানের জন্যে বেশ কিছু তত্ত্ব ও মনে মনে খাড়া করে ফেলেছে। কিছুটা আঁচ করতেও পেরেছি। অদ্ভুত আবেগ তাই আমাকেও চঞ্চল করে তুলেছে।

পুরাতত্ত্ববিদরা বিস্তর খোঁড়াখুঁড়ি করে গোটা একটা শহরকে তুলে এনেছে মরুভূমির নিচ থেকে। বালির তলায় চাপা ছিল হাজার হাজার বছর। কিন্তু আস্ত অবস্থায় নয়। গোটা শহরটাই এখন একটা বিরাট ধ্বংসস্তূপ। হোক ধ্বংসস্তূপ। ঐ ভাঙা নগরীর মধ্যেই বিপুল এক গুপ্তরহস্যের সন্ধান আমি পাবই—এ বিশ্বাস রয়েছে আমারও অণুপরমাণুতে। ওরাংওটাংটার কম্ম নয়। বালির তলা থেকে শহরটাকে বার করেছে সে ঠিকই, খোঁড়াখুঁড়িও চালিয়ে যাচ্ছে এখনও—কিন্তু পর্যবেক্ষণ করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মত ধীশক্তি ওর মগজে নেই বললেই চলে। কর্নেলিয়াসকে খুব খাতির করল বটে—শুধু ওর পদমর্যাদার জন্যে। কিন্তু বয়স কম বলে একটু তাচ্ছিল্যের ভাবও ফুটিয়ে তুলল চোখেমুখে। কর্নেলিয়াসের উদ্ভট চিন্তাধারাও হয়ত কিছু কিছু শুনেছে। তাই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গকে ঢেকে রাখতে পারল না চাহনির মধ্যেও।

বালির মধ্যে পাথর অজস্র। এই পাথর খুঁড়ে সরানো চাট্টিখানি কথা নয়। বালির ওপর পা বসে যায় একটু চাপ দিলেই। একমাস হল খোঁড়াখুঁড়িতে হাত লাগিয়েছি আমরাও। জিরা কাজের জায়গায় ফিরে গেছে বেশ কিছুদিন আগে। কর্নেলিয়াস যায় নি, খুব শিগগিরি যাবেও না। এই ভাঙা শহর ওকে যেন আবিষ্ট করে রেখেছে। আমার অবস্থাও তাই। দুজনেই বিপুল উৎসাহে বালি খুঁড়ছি, পাথর সরাচ্ছি। যত দিন যাচ্ছে, আশা ততই প্রবল হয়ে উঠছে মনের মধ্যে। প্রকাণ্ড যে প্রহেলিকা দুজনের মন কুরে কুরে যাচ্ছে, অবশ্যই তার সমাধান ঘটবে এইখানে এইখানে···এইখানে! এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে! সুদূর অতীতের ভাঙাচোরা এই শেষ নিদর্শনের মধ্যে! কর্নেলিয়াস জানে কিন্তু অনেক। এখানে এসেই শহরের প্রাচীনত্ব যাচাই করেছে নিজেই। পৃথিবীর মানুষরা যে ভাবে করে, ঠিক সেইভাবে। পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান আর ভূবিজ্ঞানের সাহায্যে। বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে একমত হয়েছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর। শহরটা সত্যিই অনেক পুরনো। দশ হাজার বছরেরও বেশি বয়স। নরবানরদের সভ্যতার অভ্যুদয় যে অলৌকিক-ভাবে ঘটেনি—এই শহরই তার অকাট্য প্রমাণ।

সুতরাং এর আগেও কিছু একটা ছিল। সেই 'কিছু একটার' অন্বেষণ করে গেছি আমরা ক্ষিপ্তের মত। কিন্তু হতাশ হয়েছি। বর্তমান যুগের শহরের সঙ্গে প্রাগৈতিহাসিক যুগের এই শহরের খুব একটা পার্থক্য চোখে পড়েনি। এযুগের নরবানররা সভ্যতার যে কটা নিদর্শনে অভ্যস্ত, তার সবই তো রয়েছে এই ভাঙা শহরেও। ধূলিসাৎ ভবন, মাটিতে মিশে যাওয়া কল-

কারখানা, মোটরগাড়ি আর উড়োজাহাজ ব্যবহারের চিহ্ন। শহরে যারা থেকেছে, তাদের মনের সঙ্গে এ যুগের নরবানরদের মনের মিল তাহলে রয়েছে। কর্নেলিয়াসের আশা আকাঙ্ক্ষা কিন্তু এইটুকু পাওয়ার চাইতেও বেশি। আমি নিজেও আশা করেছিলাম অনেক বেশি।

আজ সকালে আমার আগেই কর্নেলিয়াস রওনা হয়ে গেছে। মাটি খুঁড়ে, বালি আর পাথর সরিয়ে কোথায় নাকি একটা ইমারত চোখের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। পুরু দেওয়ালগুলো নাকি কংক্রিট জাতীয় উপাদান দিয়ে মজবুত করা। সেই কারণেই অন্যান্য ইমারতের মত মাটিতে মিশে যায় নি—টিকে আছে। খননকার্যের শুরুতে দেখা যাচ্ছে ভেতরে ঠাসা রাবিশ আর বালি। গতকাল পর্যন্ত নতুন কিছুই পাওয়া যায়নি। শহরের অন্যত্র যে সব জিনিস খুঁজেপেতে হাতে এসেছে, এখানেও দেখা গেছে সেই একই ধরনের জিনিস। যেমন, পাইপের টুকরো, গৃহস্থালির সরঞ্জাম, রান্নাঘরের জিনিসপত্র। তাঁবুর বাইরে অলসভাবে তাই বসে আছি। একই তাঁবুতে থাকে কর্নেলিয়াসও। এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি কুলির সর্দারকে হুকুম দিচ্ছে ওরাং-ওটাংটা। কুলির সর্দার একজন শিম্পাঞ্জী। চোখে ধুর্ত চাহনি। কর্নেলিয়াসকে দেখতে পাচ্ছি না। কুলিদের সঙ্গেই ট্রেঞ্চে নেমে পড়েছে। প্রায় নামে। নিজেই খোঁড়াখুঁড়ি করে। পাছে দুষ্প্রাপ্য কোনো বস্তু অপটু হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাই কারও ওপর আস্থা রাখতে পারে না।

ঐ তো উঠে আসছে কর্নেলিয়াস ট্রেঞ্চের বাইরে। দূর থেকেই বুঝলাম, বিষম উত্তেজিত, নিশ্চয় অসাধারণ কিছু একটা আবিষ্কার করেছে। হাতে একটা ছোট্ট জিনিস—এতদূর থেকে বোঝা যাচ্ছে না জিনিসটা কি। ওরাংওটাংটা এগিয়ে এসে হাত থেকে জিনিসটা নিতে যেতেই ঠেলে সরিয়ে দিল কর্নেলিয়াস। সন্তর্পণে রাখল মাটির ওপর। হাতছানি দিয়ে ডাকল আমাকে। কাছে যেতে যেতেই দেখলাম ওর চোখমুখের পরিবর্তন। অবাক হলাম।

ডাকছে বিহ্বলস্বরে—'ইউলিসি! ইউলিসি!'

কর্নেলিয়াসকে এরকম অভিভূত অবস্থায় কখনো দেখিনি। কথা বলতেও পারছে না। কুলিরা ট্রেঞ্চ থেকে উঠে এসে ওকে ঘিরে ধরায় জিনিসটাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না। আঙুল তুলে প্রত্যেকেই দেখাচ্ছে বস্তুটাকে। ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছে বেশ মজা পেয়েছে। কেউ কেউ হাসছে উচ্চকণ্ঠে। প্রায় প্রত্যেকেই বিশালকায় গরিলা। কর্নেলিয়াস ওদের তফাতে সরে যেতে বলছে।

"ইউলিসি!"

"জিনিসটা কী?"

"পুতুল, পুতুল!"

পুতুলই বটে। মামুলি চীনে পুতুল আশ্চর্যভাবে আস্ত রয়েছে। চুলের রোঁয়া দেখা যাচ্ছে। চোখের রঙও দেখা যাচ্ছে। পুতুল জিনিসটা আমার কাছে নতুন নয় বলেই প্রথমে বুঝতে পারিনি কর্নেলিয়াস এত উত্তেজিত হয়েছে কেন। উপলব্ধিটা এল সেকেণ্ড কয়েক পরে··· বিদ্যুৎ ঝলকের মত ব্যাপারটা ঝলসে উঠল মাথার কোষে কোষে! মুহ্যমান হয়ে গেলাম পুতুলের অদ্ভুত উপস্থিতির তাৎপর্য অনুধাবন করার সঙ্গে। পুতুলটা মানুষের পৃথিবীতে খুকীদের যেমন দেখতে হয় অবিকল সেইরকম!

কিন্তু এত সহজে অভিভূত হলে তো চলবে না। অত্যাশ্চর্য কাণ্ডকারখানারও মামুলি ব্যাখ্যা অন্বেষণ করা দরকার সবার আগে। কর্নেলিয়াস বৈজ্ঞানিক। নিশ্চয় সে কাজটি সেরে রেখেছে আগেই। নরবানরদের খোকা-খুকুদেরও পুতুল আছে। সংখ্যায় যদিও খুব কম। পশুপাখির পুতুল আছে। মানুষের পুতুলও আছে। সুতরাং পুতুল দেখে নিশ্চয় বিচলিত হয়নি শিম্পাঞ্জী কর্নেলিয়াস।

অতএব একটু তলিয়ে ভাবা যাক। নরবানর খোকা-খেলনার পুতুল চীন দেশে তৈরি হয় না, সব সময়ে জামাকাপড় পরানোও থাকে না। এইটাই আদৎ ব্যাপার।

পুতুলের পরনে জামা-কাপড় থাকে না। এই গ্রহে। যদিও বা সখ করে কেউ পরায়, বুদ্ধিমান প্রাণীর পরনের জামা-কাপড়ের মতন তা কখনই হয় না।

কিন্তু এই যে পুতুলটা, এর গায়ের জামা-কাপড় বাড়ির জামা-কাপড়ের মতই। ফ্রক, ব্লাউজ, স্কার্ট আর নিকারের কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে এখনও। পৃথিবীর বাচ্চা মেয়ে প্রিয় পুতুল সাজাতে বসে যে রুচির প্রকাশ ঘটায়, এই পুতুলের পোশাকে রয়েছে সেই রুচির ছাপ। সোরোর গ্রহের খোকা-খুকুরাও এমন রুচির ছাপ রেখে যায় পুতুলের জামা-কাপড়ে—কিন্তু সে পুতুল যদি হয় নরবানর খোকা অথবা খুকুর—মানুষ খোকা বা মানুষ খুকীর জন্যে কখনোই না···কখনোই না! পশুপাখি মানুষের অঙ্গে তারা কখনোই সভ্যভব্য বেশ চাপায় না!

ধড়িবাজ কর্নেলিয়াস কেন এত উত্তেজিত হয়েছে, এবার তা বুঝলাম।

শুধু এই নয়। পৃথিবীর পুতুলের সঙ্গে আশ্চর্য এই পুতুলের মিল রয়েছে আরও এক জায়গায়। অদ্ভুত মিল। অদ্ভুত বলেই কুলিরা এত হাসাহাসি করছে। গোমড়ামুখো ওরাংওটাংটাও ফিক ফিক করে হেসে ফেলছে।

পুতুলটা কথা বলছে! বাড়ির মেয়ে যেভাবে কথা বলে। ঠিক সেই ভাবে। মাটিতে নামিয়ে রাখার সময়ে

বোতাম বা চাবি টিপে ফেলেছিল কর্নেলিয়াস। পুতুল কথা কয়ে উঠেছে সঙ্গে সঙ্গে!

লম্বা চওড়া বক্তৃতা অবশ্য নয়। শুধু একটাই শব্দ 'পাপা'। অসাড় হাতে পুতুল তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছে কর্নেলিয়াস, চক্ষু স্থির হয়ে গেছে পুতুল কণ্ঠে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি শুনে।

পাপা · পাপা···পাপা: একটা শব্দই সমানে আউড়ে গেছে কথা কওয়া পুতুল। ফরাসী ভাষায় আর নরবানরদের ভাষায় এ শব্দের মানে একই—বাবা। হয়ত রহস্যময় ব্রহ্মাণ্ডের অন্যত্রও এই একই শব্দ উচ্চারিত হয় বাবাকে ডাকবার সময়ে। মানুষের চেহারায় পুতুল খুকীর কণ্ঠে এই ডাক শুনেই কিন্তু দিশেহারা হয়ে পড়েছে পরম বিজ্ঞ কর্নেলিয়াস—আরক্ত হয়ে উঠেছে চোয়াল। এই ডাক শুনেই মুহ্যমান অবস্থায় পৌঁছে গেছি আমি নিমেষ মধ্যে—এমন কি অস্ফুট চিৎকারও করে উঠেছি কর্নেলিয়াসের টানা হ্যাঁচড়ায়—আমাকে আর পুতুলকে নিয়ে তফাতে চলে আসতে চাইছিল বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক।

তফাতে এসে অনেকক্ষণ মুখে কথা সরেনি কর্নেলিয়াসের। বেশ কিছুক্ষণ পরে বলেছিল স্বগতোক্তির সুরে—"রাক্ষসী নাবালিকা!"

মানে হয় কথাটার? আমি কিন্তু বুঝেছিলাম কি বলতে চায় আমার শিম্পাঞ্জী বন্ধু তার ঐ ঘৃণা-মেশানো ক্রোধ মাখানো মাত্র দুটি শব্দের মধ্যে। বুড়ো

পুতুলকে নিয়ে তফাতে চলে আসতে চাইছিল বৈজ্ঞানিক·····

ওরাংওটাং যা বুঝতে পারেনি, শিম্পাঞ্জী কর্নেলিয়াস তা বুঝে ফেলেছে। ওরাংওটাং শুধু দেখেছে পুতুলের পোশাক, শুনেছে বাবা ডাক। ভেবেছে সুদূর অতীতের কোনো পুতুল নির্মাতার নিছক খেয়াল।

অন্য ব্যাখ্যা ওরাংওটাং-এর মাথায় ঢোকাতে গেলেও ঢুকত না। শিম্পাঞ্জী কর্নেলিয়াসের মাথায় ব্যাখ্যাটা এসে গেছে কিন্তু আপনা থেকেই। এত বিচলিত হয়েছে সেই কারণেই। অতিশয় বিচলিত হয়েছে বলেই আর মুখ খুলতে রাজি নয়। আমার কাছেও নয়।

সারাদিন মুখ বুজেই চিন্তাচ্ছন্ন রইল কর্নেলিয়াস। আমার কাছে গবেষণার ব্যাপারে অনেক কথা বলে ফেলায় কি অনুতপ্ত? উত্তেজনার প্রশমন ঘটার পরেই কি অনুতাপ জেগেছে আমাকে পুতুলটা দেখিয়ে ফেলার জন্যে?

আমার ভয় যে অমূলক নয়, তার প্রমাণ পেলাম পরের দিন সকালে। সারারাত ভেবে মনস্থির করে ফেলেছে কর্নেলিয়াস। আমাকে সঙ্গে আনাটাই যে বিরাট ভুল হয়েছে, তা নিশ্চয় বুঝেছে। তাই সকাল হতেই চোখে চোখে আর চাইতে পারল না। শুধু বললে, এখানে থাকার আর দরকার নেই আমার। ইন্সটিটিউটে এখুনি ফিরে গিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে মন দেওয়া দরকার। ধ্বংসস্তূপে খামোকা সময় কাটিয়ে আমার সময় নষ্টই হবে। প্লেনে আসন সংরক্ষিত আছে। প্লেন ছাড়বে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।

প্লেনে উঠলে বরাবরই মাথা ঠাণ্ডা করে নানান কথা ভাবি আমি। বলতে গেলে ধ্যানস্থ হয়ে যাই। এলোমেলো চিন্তাগুলোকে গুছিয়ে নিই।

ধ্বংসস্তূপ থেকে ফেরার পথে উড়ন্ত উড়োজাহাজেও মৌন হয়ে রইলাম আগাগোড়া। পাইলট একজন ছোকরা শিম্পাঞ্জী। বাচাল নম্বর ওয়ান। কিন্তু সাড়া দিইনি আমি। বুঁদ হয়ে থেকেছি নিজের চিন্তায়।

চিন্তার বিষয় একটাই। সোরোর গ্রহে মানুষ কি এককালে প্রভুত্ব করে গেছিল? তারপর অভ্যুত্থান ঘটেছে নরবানর সভ্যতার? পৃথিবীর মানবসভ্যতার মতই ছিল কি এখানকার মানব-সভ্যতা দশ হাজার বছর আগে?

সম্ভাবনাটা এখন আর নিছক অনুমিতি নয়—নির্ঘাত বাস্তব। আমার অবচেতন মনে ধারণাটা শেকড় গেঁড়ে বসে গেছিল—বাইরে প্রকাশ করতে অক্ষম হয়েছিলাম—সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এখন তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে মনের চেহারায়। সোরোর গ্রহে নরবানর সভ্যতার মূলে সব রহস্যের সমাধান হয়ে যাচ্ছে এই সত্যটা স্পষ্ট হয়ে উঠতেই।

পৃথিবীতে কি এমন সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবিনি? মেশিন আবিষ্কার করেছি, রোবট আবিষ্কার করেছি। কিন্তু নির্ভয় থেকেছি। কারণ মেশিন মেশিনই থাকবে, রোবটও থাকবে। মানুষকে নকল করে তাকে ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

কিন্তু যে প্রাণীরা প্রায় মানুষের মতই চেহারায়, এবং অনুকরণ প্রবৃত্তিতে চৌকস, তাদের ক্ষেত্রে কি এত নির্ভয় থাকা চলে? বাঁদররাই কি ভবিষ্যতের সেই ভয়ঙ্কর ভাবনা নয়?

সভ্যতা গড়ে ওঠে অনেক কিছুর সমাবেশে। এদের একটি সাহিত্য। ধ্রুপদী রচনা শতাব্দীতে দু-একটা সম্ভব। নকল হয় হাজারে হাজারে। করে মানুষ সাহিত্যিকরা। কিন্তু নকলি বিদ্যায় দড় নরবানররা যদি পাল্লা দেয়?

ভাষা? ধ্রুপদী সাহিত্যের লেখকরাই সৃষ্টি করেন। নাড়াচাড়া করে অন্যান্যরা। কোষ বিকৃতির ফলে নরবানররা যদি সেই পর্যায়ে উন্নীত হয় ধীরে ধীরে? ভাষা নকল করা কি কঠিন?

শতাব্দীর পর শতাব্দী গেছে, কথামালায় আরও রপ্ত হয়েছে নরবানররা। পৃথিবীতেও কি তাই ঘটছে না?

সোরোর গ্রহের মিউজিয়ামে রাখা ছবিগুলোকে কি এমনিভাবে নকল করা হয়নি? তারপর শিখেছে ছবির কৌশল?

কর্নেলিয়াসের সঙ্গে ঘুরেছি শহরের নানান জায়গায়। আদালতের মতই। পৃথিবীতে যেমন শেখা বিদ্যে উগড়ে দেওয়া হয়—এখানেও তাই।

শেয়ার মার্কেটে গেছি, দেখেছি একই উন্মত্ত দৃশ্য। বিশাল হলঘর জুড়ে সেকী পাগলামি! শূন্য পথে অনবরত লাফিয়ে যাচ্ছে বাঁদররা। পৃথিবীর শেয়ার বাজারেও তো দেখেছি অনবরত লাফঝাঁপ আর পাগলের মত চেঁচানি।

উড়োজাহাজ মাটি স্পর্শ করতেই চিন্তা থামালাম। জিরা এসেছে এয়ারপোর্টে আমাকে নিয়ে যেতে।

মনটা নিমেষে হাল্কা হয়ে গেছিল ওকে দেখে। ছোট বোনের মতই যেন আপন জন। [চলবে]

পূজো সংখ্যায় অদ্রীশ বর্ধনের দুর্দ্ধর্ষ উপন্যাস

রক্তের মধ্যে বিষ

আমাদের খনিজ সম্পদ

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাদের দেশ এই অপরূপ ভারতবর্ষ প্রায় একটি মহাদেশের মতো। উত্তরে কাশ্মীর থেকে দক্ষিণে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত 3200 কিলোমিটার (গ্রেট নিকেবর ধরলে আরো বেশি) আর পূর্বে নাগাল্যান্ড থেকে গুজরাট পর্যন্ত দূরত্ব 3000 কিলোমিটারেরও বেশি। ভারতের আয়তন কম নয় প্রায় 32,74,000 বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীর কেবল মাত্র ছ'টি দেশ—সোভিয়েত রাশিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, অসট্রেলিয়া ও চীন—ভারতের চেয়ে আয়তনে বড়।

এই বিশাল ভারতের ভূ-প্রকৃতিতে কত না বৈচিত্র্য। কত ধরনের শিলাই না রয়েছে ভারতের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে। উত্তরে হিমালয় কিংবা দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে যে নানা প্রয়োজনীয় খনিজই রয়েছে, তা যে ভারতের আর্থিক বনিয়াদকে খুবই শক্ত করে তুলেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতে যে সব খনিজ পদার্থের ভাণ্ডার রয়েছে, তার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে কয়লা পেট্রোলিয়ামের মতো জ্বালানি, তেমনি অন্যদিকে রয়েছে লোহার আকরিক কিংবা বকসাইটের মতো খনিজ যা থেকে আমরা পাচ্ছি পরম প্রয়োজনীয় লোহা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের মতো ধাতু। অথবা ধরা যাক চুনাপাথরের কথাও, যা থেকে তৈরি হয় সিমেণ্ট। সিমেণ্ট যে আমাদের কোন কাজে লাগে তা' নিশ্চয়ই তোমাদের নতুন করে বোঝাবার দরকার নেই। এই তালিকাটি মোটেই সব নয়। এগুলি ছাড়াও রয়েছে আরো নানা ধরনের নানা প্রয়োজনের হরেক রকম খনিজ।

প্রথমেই বরং বলি কয়লার কথা। যাকে লোকে আদর করে ডাকে 'ব্ল্যাক ডায়মণ্ড' অর্থাৎ কালো হীরে। হাল আমলে পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার বাড়লেও এখনো পর্যন্ত ভারতবর্ষে বিদ্যুৎ ও শক্তি সরবরাহের কাজে কয়লার স্থান এক নম্বরে।

সাধারণ ভাবে কয়লা বলতে বোঝায় কালো রংয়ের অঙ্গার (carbon) খনিজ, যা পৃথিবীর বুকে স্তরীভূত পাথরের আকারে পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, এই কয়লার জন্ম উদ্ভিদ জাতীয় পদার্থ থেকে রূপান্তরের ফলে। কয়লার মূল রাসায়নিক উপাদান কারবন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। অবশ্য এছাড়াও রয়েছে কিছুটা নাইট্রোজেন ও গন্ধক।

উদ্ভিদ থেকে ভৌত ও রাসায়নিক এই দু'রকমের পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন পর্যায়ে যে নানা ধরনের কয়লার উৎপত্তি হয়, তা' মোটামুটি চার ধরনের—যেমন (1) পিট, (2) লিগনাইট, (3) বিটুমিনাস কয়লা ও (4) অ্যানথ্রাসাইট।

সত্যি বলতে কি, পিটকে (Peat) ঠিক কয়লা বলা হয়তো চলে না। তবে যেহেতু উদ্ভিদ পদার্থ থেকে পরিবর্তনের ফলেই পিটের উৎপত্তি, তাই একে

কয়লার ভেতরে রাখা হয়েছে। পিট বেশ হালকা, ছিবড়ে জাতীয়, রং হালকা বাদামী থেকে গাঢ় বাদামী। ভালো করে লক্ষ্য করলে নজরে পড়ে এর ভেতরে গাছপালার সূক্ষ্ম অংশ রয়েছে। উৎকৃষ্ট জাতের জ্বালানি না হলেও মাঝে মাঝে পিট থেকে ইঁটের মতো ব্রিকেট তৈরি হয়।

বাদামী রংয়ের জন্য লিগনাইটের (lignite) আরেক নাম 'বাদামী কয়লা'। লিগনাইটের দহন ক্ষমতা যথেষ্টই। পোড়ালে দীর্ঘ আগুনের শিখা বেরোয়। প্রোডিউসার গ্যাস তৈরির কাজে লিগনাইট চাহিদা পুরোদস্তুর। এছাড়া সহজেই ভেঙ্গে গুঁড়ো হবার প্রবণতা থাকায় লিগনাইটের ব্রিকেটও তৈরি হয়। এহেন লিগনাইটের সন্ধান মিলেছে আসাম, কাশ্মীর, কেরালা, রাজস্থান ও তামিলনাড়ুতে। এছাড়া পশ্চিম বাংলার দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ি জেলায় খানিকটা লিগনাইট পাওয়া গেছে।

বিটুমিনাস (bituminous) কয়লার নামকরণ 'বিটুমেন' থেকে। এই ধরনের কয়লার পাতন থেকে পাওয়া যায় আলকাতরা, যার প্রকৃতি অনেকটা বিটুমেনের মতো। বিটুমিনাস কয়লার রং কুচকুচে কালো, কখনো বা ধূসর কালো। এছাড়া এতে স্তর-বিন্যাসের চিহ্নও দেখতে পাওয়া যায়। উজ্জ্বল আর ফ্যাকাশে—এই দু'ধরনের কয়লার পাশাপাশি স্যান্ডউইচের মতো থাকার ফলেই এই স্তরবিন্যাস। লিগনাইটের তুলনায় বিটুমিনাস কয়লা অনেক শক্ত, তাই বাইরে খোলা জায়গায় বহুদিন রাখা সম্ভব। গ্যাস তৈরি, বয়লার বা রেল ইঞ্জিনের জন্য বিটুমিনাস কয়লা প্রায় আদর্শ স্থানীয়। উত্তাপ ক্ষমতার উৎকৃষ্টের জন্য বিটুমিনাস কয়লা প্রায় সমস্ত কাজেই ব্যবহারযোগ্য।

মাটির নিচে কয়লার জন্য ড্রিলিং চলছে।

অ্যানথ্রাসাইট (anthracite) কয়লা বিটুমিনাস কয়লার চেয়েও শক্ত। রং লোহার মতো কালো অথচ ধাতুর মতো উজ্জ্বল। এই কয়লা ধরলে হাত ময়লা হয় না। কিন্তু কাচের ধাতুর মতো বাঁকাভাবে ভেঙ্গে যায়। বিটুমিনাস কয়লার তুলনায় বেশি জ্বলে, আর এর আগুনের রং ধোঁয়াহীন হালকা নীল। উত্তাপ ক্ষমতা ও ধোঁয়াহীনতার জন্যই ধাতু নিষ্কাশনের কাজে এই কয়লার খুবই কদর। এ ধরনের কয়লা পাওয়া যায় কাশ্মীরে হিমালয়ের গণ্ডোয়ানা (gondwana) যুগের পাথরে।

ভারতে কয়লার সন্ধান মিলেছে দু'টি আলাদা ভূতাত্ত্বিক যুগ অর্থাৎ (1) গণ্ডোয়ানা ও (2) টারশিয়ারি (tertiary) যুগের পাথরে। তবে উৎকর্ষ ও পরিমাণের দিক থেকে গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লা খুবই উল্লেখযোগ্য। এই যুগের কয়লার বয়স আনুমানিক সাড়ে চার থেকে ছ'কোটি বছর। ভারতে মোট উৎপাদনের শতকরা প্রায় 99 ভাগ কয়লাই আসে গণ্ডোয়ানা যুগের পাথর থেকে। তবে দেড় থেকে দু' কোটি বছর বয়সের টারশিয়ারি কয়লা ভারতে মোট উৎপাদনের পরিপ্রেক্ষিতে সামান্য হলেও স্থানীয় প্রয়োজনের পক্ষে খুবই দরকারী। বিভিন্ন জাতের কয়লার ভেতরে গণ্ডোয়ানা যুগের বিটুমিনাস কয়লা আর টারশিয়ারি যুগের কয়লার কথাই উল্লেখ করতে হয়। কারণ পিট আর অ্যানথ্রাসাইট ভারতে প্রায় নেই বললেই চলে।

গণ্ডোয়ানা যুগের কয়লাক্ষেত্র (coalfield) রয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, ওড়িশা, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র আর সিকিমে। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কয়লাক্ষেত্রের মধ্যে ঝরিয়া কয়লাক্ষেত্র, রাণীগঞ্জ, বোকারো ও করনপুরা কয়লাক্ষেত্রের নামই সবচেয়ে আগে উচ্চারণ করতে হয়।

ভারতে বিটুমিনাস কয়লার মোট মজুতের পরিমাণ প্রায় 15 হাজার কোটি মেটরিক টন ও লিগনাইটের মজুত প্রায় 400 কোটি মেট্রিক টন। এত কয়লায় হেসেখেলে ভারতের হয়তো আগামী একশো বছর চলে যাবে। কিন্তু তার পর ?

কয়লার পর আসি পেট্রোলিয়ামের কথায়। পেট্রোলিয়াম কথাটি এসেছে ল্যাটিন থেকে। পেট্রা মানে পাথর আর অলিয়াম বলতে বোঝায় তেল। সব মিলিয়ে মানে দাঁড়ায় পাথরের বুকে সঞ্চিত ঢেউ। সাম্প্রতিক কালে পেট্রোলিয়ামের রমরমা হলেও বহু প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এর কথা জানত। শোনা যায়, চীনা ও জাপানীরা নাকি তৃতীয় শতকে পেট্রোলিয়াম ব্যবহার করত। মিশরীয়রাও 'মমি' সংরক্ষণের জন্য ভিজিয়ে রাখত খনিজ তেলে।

এই পেট্রোলিয়াম যার আরেক নাম 'তরল সোনা', তা আধুনিক যুগের নানা কাজে একান্তই অপরিহার্য। যেমন ধরা যাক, আধুনিক যুগের বাহন—মোটর ও বাসের জন্য পেট্রোল বা ডিজেল, পাড়াগাঁয়ে লণ্ঠন জ্বালাবার

কাজে কেরোসিন, এমন কি এ যুগের আধুনিক পক্ষীরাজ এরোপ্লেনের জন্যও যে তরল জ্বালানির প্রয়োজন, তা' সবই আসে পেট্রোলিয়াম থেকে। শুধু কি তাই, আধুনিক মানুষের পরিধেয় রকমারি নাইলন, টেরিলিন বা আধুনিকতম গৃহসজ্জার অঙ্গ ফরমাইকা কিংবা ডেকোলাম এই পেট্রোলিয়ামেরই বংশধর। একথা জানলে খুবই অবাক লাগবে। রূপচর্চার রকমারি কসমেটিকসও তৈরি হয় পেট্রোলিয়াম-জাত উপাদান থেকেই।

মোটামুটিভাবে পেট্রোলিয়াম বলতে খনিজ তেল বোঝালেও এর মধ্যে কিন্তু তিনটি ভাগ—(1) তরল বাদামী রংয়ের খনিজ তেল, (2) প্রাকৃতিক গ্যাস ও (3) চটচচে বিটুমেন টার ও পিচ।

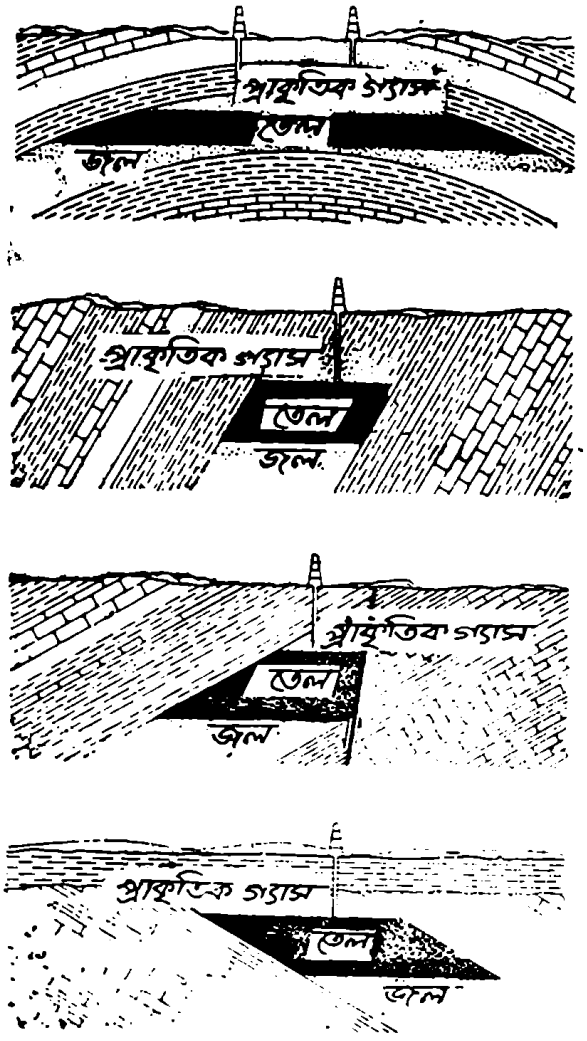

অপরিশুদ্ধ খনিজ তেল আসলে নানা ধরনের হাইড্রোকারবনের জটিল মিশ্রণ। আর প্রাকৃতিক গ্যাস যা খনিজ তেলের সঙ্গেই পাওয়া যায়, তার মূল উপাদান মিথেন গ্যাস (শতকরা 80 ভাগ), যদিও সঙ্গে কিছুটা ইথেন, প্রোপেন, বুটেনের মতো উদ্বায়ী (volatib) হাইড্রোকারবনও থাকে।

পেট্রোলিয়ামের জন্ম কীভাবে হলো, তা' বিজ্ঞানীদের মধ্যে তর্ক-বিতর্কের শেষ নেই। তবে এর উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা মতবাদ চালু থাকলেও সবচেয়ে জনপ্রিয় মতবাদটি হলো সমুদ্রের নিচে পাললিক শিলার ভেতরে আদিম সামুদ্রিক প্রাণী ও উদ্ভিদ থেকে নানা ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়েছে পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস।

কোন কোন বিজ্ঞানী (যেমন সোভিয়েত বিজ্ঞানী ডঃ শাখিনিন, কিংবা আমেরিকান বিজ্ঞানী ডঃ গোল্ড) অবশ্য বিশ্বাস করেন, পেট্রোলিয়ামের জন্মের ব্যাপারে সামুদ্রিক প্রাণী বা উদ্ভিদের কোন ভূমিকা নেই। খনিজ তেলের সৃষ্টি অজৈব (iuo.ganie) উপায়ে—পৃথিবীর শিলাস্তরে সঞ্চিত কারবাইডের সঙ্গে জলের বিক্রিয়ার ফলে। কিন্তু জৈব অথবা অজৈব-কোন প্রক্রিয়াতে সত্যি সত্যিই খনিজ তেলের জন্ম—এ নিয়ে দু'দল বিজ্ঞানীর মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই।

পেট্রোলিয়ামের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের জ্ঞান ক্রমেই বৃদ্ধি পেলেও আজ পর্যন্ত কারো পক্ষেই ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নয়—ঠিক কোথায় কোন পাথরে পাওয়া যাবে পেট্রোলিয়াম। করণ মাটির ওপর দাঁড়িয়ে পাতালে লুকনো পেট্রোলিয়ামের খবর জানা যাবে কেমন করে? তবে অভিজ্ঞতা, ভূবিদ্যা সম্পর্কে জ্ঞান ও যন্ত্র—এই তিনের সাহায্যেই ভূবিজ্ঞানীরা পাথরের ভেতর থেকে খুঁজে বের করেন পেট্রোলিয়ামের টিকি। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধানের যে যন্ত্রগুলি ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে রয়েছে এ্যাভিমিটার, ম্যাগনেটোমিটার ও সিসমোগ্রাফ। তবে এখানেই শেষ নয়। তাই শেষ পর্যায়ে ড্রিলিং করে পাথর ফুড়ে ড্রিলিং করে পেট্রোলিয়াম বের করা হয়। এতসব জানলেও ভারতে প্রথম কোথায় পেট্রোলিয়াম আবিষ্কৃত হয়েছিল সে কাহিনী বোধহয় তোমরা অনেকেই জানো না। 1889 সাল। তখন আসামে লিডো থেকে ডিবরুগড় পর্যন্ত রেললাইন পাতবার কাজ চলছে। কাজ করবার সময় একদিন আসাম রেলওয়ে ও ট্রেডিং কোমপানির ইনজিনিয়াররা দেখতে পেলেন ওদের এক হাতির পায়ের তলায় কালো চটচটে কী একটা জিনিস। নেহাতই কৌতূহলের বশে হাতির পায়ের দাগ ধরে একটা ডোবায় পৌঁছলেন ওরা। আর সেই ডোবাতেই ছিল পেট্রোলিয়াম বা খনিজ তেল। জায়গাটার নাম ডিগবয়। তারপর 1899 সালে প্রতিষ্ঠিত হলো আসাম অয়েল কোম্পানি। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এর চেয়ে প্রায় 40 বছর আগে 1859 সালে প্রথম তেলকূপ খনন করেছিলেন এডউইন ড্রেক।

টারশিয়ারি যুগের তৈলবাহী পাললিক শিলাস্তর ভারতের নানা জায়গাতে ছড়িয়ে আছে। তবু এখনো পর্যন্ত ভারতের মাত্র তিনটি জায়গাতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে

পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচ্ছে। একটি অঞ্চল সুদূর উত্তর-পূর্ব ভারতের আসাম ও অরুণাচলে, আর দুটি পশ্চিম প্রান্তে—গুজরাট ও বোম্বে হাই অঞ্চলে। তবে এখন সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে জোর কদমে তেলের অনুসন্ধান চলছে। কয়েকটি জায়গায় অদূর ভবিষ্যতে পেয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও খুবই প্রবল। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সত্যিই একটি উজ্জ্বল নাম।

আসামের মধ্যে যেসব জায়গায় পেট্রোলিয়াম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, হুগরিজান, মোরান, রুদ্রসাগর ও লাকুয়া তৈলক্ষেত্রের নাম। অরুণাচলে খারসং ও নাগাল্যাণ্ডের চামপাং-এ খনিজ তেল মিলেছে। আসামের তৈলক্ষেত্র থেকে বছরে প্রায় 53 লক্ষ মেটরিক টন পেট্রোলিয়াম পাওয়া যাচ্ছে।

বোমবাই শহর থেকে 120 কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে সমুদ্রের ভেতরে অবস্থিত 'বোমবে হাই' তেলকুপ থেকে পেট্রোলিয়াম বেরিয়ে আসে 1974 সালের 19শে ফেব্রুয়ারি। আপাতত এখান থেকে বছরে 200 লক্ষ মেটরিক টন পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচ্ছে। গুজরাটে খনিজ তেল মিলেছে কামবে, কালোল, আংকেলেশ্বর, নওয়াসাঁও, সানন্দা ওলপাদ ও কোসাম্বা অঞ্চলে। গুজরাট থেকে বছরে তেল মিলছে প্রায় 40 লক্ষ মেটরিক টন।

এখনো পর্যন্ত ভারতে যতটা পেট্রোলিয়ামের সন্ধান মিলেছে, তা' বিরাট না হলেও অন্তত বছর পঞ্চাশেক ভারতকে তেল জুগিয়ে যাবে। কিন্তু তার পর কী হবে। এই চিন্তার ফলে নিত্য নতুন তৈলক্ষেত্র আবিষ্কারের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হচ্ছে।

কয়লা ও পেট্রোলিয়াম ছাড়াও অন্য যে জ্বালানি রয়েছে তা' হলো পারমাণবিক জ্বালানি। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ইউরেনিয়ামের খনিজ। এ থেকেই পারমাণবিক শক্তিকেন্দ্রে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে। ইউরেনিয়ামের প্রধান আকরিক ইউরসিনিনাইট বা পিচব্লেন্ড। এর রাসায়নিক সংকেত $2yO_2 \cdot O_3$। ভারতের বেশ কয়েকটি জায়গায় ইউরেনিয়ামের সন্ধান মিলেছে। তবে কেবলমাত্র বিহারের সিংভূম জেলার যাদুগোরা অঞ্চলেই ইউরেনিয়াম উত্তোলনের খনি রয়েছে। যাদুগোরা ছাড়াও বিহারের গয়া, মুংগের ও হাজারিবাগ অঞ্চলে ও রাজস্থানের আজমীর ও ভিলওয়ারা জেলায় ইউরেনিয়ামের আকরিকের হদিশ মিলেছে।

এই তিন ধরনের জ্বালানি ছাড়াও ভারতে আরো নানা প্রয়োজনের খনিজ রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। এর মধ্যে ধাতব খনিজ পদার্থের উজ্জ্বল উল্লেখ হলো সোনা, রুপা, তামা, সীসা, দস্তা, ম্যাঙ্গানিজ, লোহা, নিকেল ও ক্রোমিয়াম ধাতুর আকরিক। এসব আকরিক আমাদের উপহার 3 পরম প্রয়োজনের ধাতব সম্পদ এর মধ্যে লোহা ও ম্যাঙ্গানিজ আকরিক ভারতে যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

অধাতব খনিজ পদার্থের মধ্যে বলতে হয় চীনা মাটি, দুর্গল মাটি, চুনাপাথর, ডলোমাইট, বকসাইট, ম্যাগনেসাইট, অভ্র, জিপসাম, ব্যারাইট, গ্রাফাইট ও ফসফেট পাথরের কথা, যা ভারতের খনিজ শিল্পকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে নিঃসন্দেহে। ভারতে চীনামাটি, বকসাইট কিংবা চুনাপাথরের বিশাল মজুত ভাণ্ডার রয়েছে। যা ভারতকে আগামী একশো বছর ধরে একনাগাড়ে কাঁচা মাল জুগিয়ে যাবে এটা নিঃসন্দেহে বুক ফুলিয়ে গর্ব করে বলার মতো খবর। স্থান সংক্ষেপে এদের সম্বন্ধে সব কথা বলা গেল না। পরে কোন সময় বলবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

B4/2 ঈশ্বরচন্দ্র নিবাস। কল-54

---

30 পৃষ্ঠার শেষাংশ]

করে। এই কার্ডগুলো সাধারণতঃ লম্বায় $7\frac{3}{8}$ ইঞ্চি আর চওড়ায় $3\frac{1}{4}$ ইঞ্চি হয় এবং পর পর 80টি সারিতে ভাগ করা থাকে। প্রতিটি সারিতে 12টি করে অবস্থান আছে যেখানে ছিদ্র করা যেতে পারে। এই ছিদ্রগুলোর বিভিন্ন অবস্থানের উপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তার ভাষা ঠিক বুঝে নিতে পারে সাধারণতঃ এই রকম কার্ডে কম্পিউটার মিনিটে 600 থেকে 2000 পর্যন্ত পড়তে পারে। ছোটখাট ব্যাপারে এইরকম পাঞ্চড্ কার্ডই ব্যবহার করা হয়।

যন্ত্রের চিন্তাশক্তি নেই অথচ অঙ্ক কষতে পারে শুনে সত্যই একটু অবাক লাগে। একটু খোঁজ নিয়ে দেখা যাক কম্পিউটার কি করে অঙ্ক কষে। কম্পিউটারের মধ্যে বিশেষভাবে বিন্যস্ত থাকে বৈদ্যুতিক সুইচ আর তারের জাল। এই সমস্ত তার এবং সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ গাণিতিক নিয়মে প্রবাহিত হয়। এইভাবে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মান কোন সংখ্যার যোগফল ইত্যাদির সঙ্গে তুলনা করে কম্পিউটারে অঙ্ক কষা হয়।

এতক্ষণ যে কম্পিউটারের কথা বললাম তাকে বলা হয় ডিজিটাল কম্পিউটার (ডিজিট=সংখ্যা)। আর এক রকম কম্পিউটার হচ্ছে অ্যানালগ কম্পিউটার। অ্যানালগ কম্পিউটারে অবিরাম বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়। ডিজিটালের মত স্পন্দনে প্রবাহিত হয় না। সেই বিদ্যুৎপ্রবাহের মানের সঙ্গে পরোক্ষভাবে তুলনা করে কোনও প্রশ্নের বা সমস্যার সমাধান পাওয়া যায়। চিকিৎসা শাস্ত্রে বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রেই অ্যানালগ কম্পিউটার ব্যবহার করা হয়। দুই ধরনের মিশিয়ে হাইব্রিড কম্পিউটারও আজকাল ব্যবহৃত হয়।

গঙ্গাপুরী শিক্ষাসদন

জুলে ভার্ণ-এর
দ্য ব্ল্যাক ডায়মন্ডস

চিত্রনাট্য - অনিল কর্মকার
রূপায়ণ- গৌতম কর্মকার

খবর শুনে জ্যাক বিয়ান হাসলো।
ও...রে বাবা, দেশলাইয়ের দরকার হয় না। আগুন-ডাইনীদের নিঃশ্বাসেই বাতাসে আগুন ধরে যায়।
দু দিন পর--
হ্যারিকে এক হাত দেখে নেবো। কী ভেবেছে ও? একটা খবর পর্যন্ত দিলে না! আগে তো ওখানে যাই, তারপর-
কী ব্যাপার? রেলস্টেশনে পোস্টার?
গত ৪ ডিসেম্বর থেকে ইঞ্জিনীয়ার জেমস স্টারের কোনও খবর নেই। গ্লাস্টনশায়ার থেকে প্রিন্স অব ওয়েলস জাহাজে যাত্রা করে তিনি স্টার্লিং স্টেশনে নেমেছিলেন। তারপর থেকে নিরুদ্দেশ। কেউ তাঁর কোনও খবর জানলে এডিনবরার রয়্যাল ইন্সটিটিউটের প্রেসিডেন্টকে দয়া করে জানান।
আজব ব্যাপার! ৪ ডিসেম্বরই তো ওঁকে ডোচার্ট পিটে নামতে দেখেছিলাম। তারপর? এই জন্যই কি হ্যারি আসেনি?
ইয়ারো স্যাফটে পৌঁছুতেই হবে- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব-
অনেক দেরী হয়ে গেছে। কে জানে-ওরা এখন কী অবস্থায় রয়েছে। নাকি এখানেও সেই আগুন-ডাইনী?

উঃ, আর পারছি না। শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে। আর কটা মই বাকী?
সর্বনাশ! মই আর নেই। কে সরিয়ে নিয়েছে। উঃ, কী ভয়ানক ব্যাপার!
একটি অসাবধান হলেই অতল গহ্বরে হারিয়ে যেতাম। ইঞ্জিনীয়ার বোধহয় এই কারণেই ফিরে আসতে পারেননি। হ্যারিদেরই বা কী হোল? খাবার-দাবার আছে তো? নাকি সব শেষ? দুশ দিন হয়ে গেল---
---হ্যারি হ্যারি---
--- মিস্টার সাইমন---
---মিস্টার স্টার্---
নাহ, কেউ কোথাও নেই। এখন একটাই উপায়--- এডিনবরা-- রয়্যাল ইন্সটিটিউট
এডিনবরার পথে রওনা হয়ে গেল জ্যাক---
বেলা তিনটেয় লর্ড প্লোভোস্টের বাড়ী এসে জ্যাক পৌঁছলো।
তোমার কথাই ঠিক মনে হচ্ছে। এ কারো এক ভয়ংকর ষড়যন্ত্র! এলফিনস্টোনকে খবর পাঠাচ্ছি। মিস্টার স্টারের বন্ধু। একদল সঙ্গী নিয়ে উনি প্রস্তুত হয়েই আছেন।
থ্যাঙ্ক ইউ স্যার।
19

সন্ধ্যার মুখে সবাই ইয়ারো স্যাফটে পৌঁছলেন। তারপর—
মই শেষ হতে দড়ির মই নামিয়ে দেওয়া হোল খনির গর্তে।
সাবধান সবাই... এক পা এক পা করে...
মাটিতে পা দিয়েই জ্যাক স্তম্ভিত...
উঃ, মইগুলো নামিয়ে কোনও শয়তান এখানে পুড়িয়ে ফেলেছে।
হ্যারি, এই হ্যারি! মিস্টার জোনস! নাঃ, কারও সাড়া নেই।
আসবাবপত্র... খাবার-দাবার সব ঠিকঠাক। কেবল বাসিন্দারাই নেই। গেল কোথায় সব?
এই দেখুন স্যার-ক্যালেন্ডার। হ্যারির মা এই ক্যালেন্ডারে প্রতি দিন দাগ দিয়ে তারিখের হিসাব রাখতেন।
DECEMBER
শেষ দাগ পড়েছে ৫ ডিসেম্বর...
20

বিরাট এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে প্রতিষ্ঠানটা। চারপাশে এলাকাটা ঘিরে রেখেছে সবুজ অরণ্যে ঘেরা পাহাড়।

বিচিত্র এক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানে তৈরি হয় হাজারে হাজারে রোবট অর্থাৎ যন্ত্রমানুষ। আর সেই যন্ত্র মানুষদের রপ্তানি করা হয় দেশ বিদেশের নানা প্রান্তে। আজ একবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পৌঁছে মহীরুহ হয়ে উঠেছে এই জাতীয় রোবট তৈরির কারখানাটি।

সত্যিই এ এক অতি আশ্চর্য অথচ আধুনিক কারখানা। নামটাও চমক লাগানো 'নিউটনের বাগান'। বিশ্ববিখ্যাত সেই বিজ্ঞানী স্যার আইজ্যাক নিউটনের প্রতি সম্মান জানানোর উদ্দেশ্য নিয়েই হয়েছে এই নামকরণ। পৃথিবীর কোন দেশে এমন প্রতিষ্ঠান আর কোথাও নেই। ভারতবর্ষের গর্ব নিউটনের বাগান। সারা পৃথিবী জুড়ে যন্ত্রমানুষদের চাহিদা যে উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে একদিন স্থাপন করা হয় এই প্রতিষ্ঠানটি। আজ গৌরবে কর্মক্ষমতায় পৃথিবীর সেরা দেশগুলোও তার কাছে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে। সব দেশেই নিউটনের বাগানের রোবটদের চাহিদা।

নিউটনের বাগান নামকরণের মধ্যে কিন্তু লুকিয়ে আছে আরও একটা সুন্দর কারণ। সে কথা জানতে হলে প্রথমেই জানা দরকার এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণপুরুষ প্রফেসর চিদাম্বরমের জীবন কথা। আশ্চর্য প্রতিভাধর আর কর্মদক্ষ মানুষ প্রফেসর চিদাম্বরম। এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই। দীর্ঘ পরিশ্রম আর অক্লান্ত চেষ্টায় চিদাম্বরম গড়ে তুলেছেন এই বিরাট প্রতিষ্ঠানটি। পৃথিবীতে বিজ্ঞানী হিসেবে প্রফেসর প্রতিটি দেশেই সুপরিচিত একজন বিজ্ঞানঅন্ত প্রাণ মানুষ। সকলের শ্রদ্ধারও পাত্র। বয়স প্রায় ষাট হলেও তিনি যুবকের মতই কর্মঠ।

নিউটনের বাগানের নামকরণে প্রফেসর চিদাম্বরমের ভূমিকাই সবার চেয়ে বেশি। এই কারখানায় যারা কাজ করে তারা শতকরা পঁচানব্বই জনই রোবট বা যন্ত্রমানুষ। মানুষ তার যন্ত্র একসঙ্গে এই কারখানায় উৎপাদনের সব ধারা বজায় রেখেছে। প্রফেসর তাই বিজ্ঞানী নিউটনের নাম এর সঙ্গে গেঁথে রাখতে চেয়েছেন।

কারখানার চিমনি দিয়ে হালকা ধোঁয়ার রেখা ফুটে উঠেছিল। সকাল ন'টা। কারখানার কাজ শুরু হয়েছে

সবেমাত্র। ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে এখানকার কাজ, কোন ব্যতিক্রম ঘটে না। এই কারখানা অন্যদিক দিয়েও অভিনব—কোন শ্রমিক অশান্তি এই প্রতিষ্ঠানের কাজের ধারা স্তব্ধ করতে পারে না।

ঘড়ির কাঁটা ধরে কাজ করেন প্রফেসর চিদাম্বরমও স্বয়ং। তার কাছে মানুষ বা যন্ত্রের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। প্রতিদিন নিজের ঘরে এসে বসার পর তিনি দেখা করেন কারখানা ঘুরে দেখতে আসা প্রার্থীদের সঙ্গে। তাদের অনুমতি নিতে হয় তারই কাছ থেকে।

সেদিনও প্রফেসর চিদাম্বরম নিজের ঘরে টেবিলের সামনে বসে একটা ফাইলে চোখ বুলিয়ে চলেছিলেন। প্রফেসরের মনসংযোগে বাধা পড়ল তারই সেক্রেটারি অশীন মিত্র এসে পড়তে।

নিউটনের বাগানে সত্যিকার রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে যারা আছে তাদের মধ্যে স্বয়ং প্রফেসর চিদাম্বরম ছাড়া আছে তার এই সেক্রেটারী অশীন মিত্র, প্রবাল রায়, রামানুজম আর সুভাষ প্যাটেল। এরা সকলেই বয়সে তরুণ আর সকলেই নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত।

এই পাঁচজন মানুষ ছাড়া যারা কাজ তদারক করে আর সমস্ত শ্রমিকই রোবট বা যন্ত্রমানুষ। এই যন্ত্রমানুষদের মধ্যে রয়েছে বিশাল, ধীমান, ধীরাজ, রোবো আর সুরেষ।

আশ্চর্য ঘটনা আরও আছে। আর সেটা হল এই পাঁচজন রোবট সুপারভাইজার আর রোবট শ্রমিক নিজেরাই। মানুষের চেহারা আর আকৃতির সঙ্গে তাদের প্রায় কোন তফাত নেই। এরা সকলেই আধুনিক যান্ত্রিক কুশলতার এক আশ্চর্য আর নিখুঁত উদাহরণ।

অশীন মিত্র প্রফেসরের সামনে এসে দাঁড়াতেই তিনি মুখ তুলে তাকালেন।

'কি ব্যাপার অশীন, কোন দর্শনার্থী এসেছে আজ?' চিদাম্বরম প্রশ্ন করলেন।

'হ্যাঁ, স্যার। দুজন। ডাকবো ওদের?

'হ্যাঁ, ডাকো।'

অশীন মিত্র এবার দুজন তরুণ দর্শনার্থীকে নিয়ে প্রফেসরের সামনে এসে দাঁড়াল। একজন তরুণ আর একজন তরুণী।

প্রফেসর চিদাম্বরম ওদের বসতে বললেন।

'তোমরা অনেক ছোট তাই তুমিই বলি, কেমন?' তিনি বললেন।

'নিশ্চয়ই। আমি আর আমার বোন আপনাদের এই কারখানা দেখতেই এসেছি। শুনেছি তাতে কোন বাধা নেই। আমার নাম তরুণ আর আমার বোন এষা।'

'না, কোন বাধা নেই। তবে এর আগে জানতে চাই তোমরা এত আগ্রহী কেন।'

'আমি আর এষা দুজনেই বিজ্ঞানকে ভালবাসি। নতুন কিছু ভালবাসি বলেই আমরা ছুটে যাই যেখানে নতুন কিছুর সন্ধান পাই।'

তরুণ বললো।

'খুব ভাল কথা। তোমাদের অনুমতি দিচ্ছি। অশীন—;

'বলুন, স্যার।'

'ধীমানকে ডাকো,' প্রফেসর চিদাম্বরম বললেন।

অশীন বেরিয়ে গিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে এল একজনকে। ফিটফাট পোশাক। দেখে বয়স আন্দাজ করা যায় না।

'এ হলো আমাদের কারখানা মেশিন রুমের ফোরম্যান ধীমান।'

'হ্যাঁ, শুধুই ধীমান,' চিদাম্বরম বললেন। 'এ একজন যন্ত্রমানুষ। আশ্চর্য হচ্ছো তোমরা?'

তরুণ আর এষা সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেল।

'ধীমান,' প্রফেসর চিদাম্বরম বললেন, 'এরা দুজন কারখানা ঘুরে দেখতে চায়। তুমিই দায়িত্ব নাও সব দেখিয়ে দেবার, কেমন?'

'ঠিক আছে, স্যার,' ধীমান উত্তর দিলো। তারপর তরুণ আর এষার দিকে তাকিয়ে বললো, 'আসুন।'

তরুণ আর এষা প্রায় মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে ধীমানের পিছনে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

ওরা এবার বিরাট একটা ঘরের মধ্যে গিয়ে পৌঁছল। অদ্ভুত একটা দৃশ্যই যেন ওদের জন্য অপেক্ষা করছিল।

অসংখ্য শ্রমিক এক মনে নানা যন্ত্রাংশ নিয়ে কাজ করে চলেছে। কোথাও কোন শব্দ নেই। নিখুঁত যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংযুক্ত হয়ে চলেছে অসংখ্য যন্ত্রমানুষ।

কেউ ওদের দিকে মুখ তুলে তাকালো না। সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত।

ধীমান এগিয়ে চলতে এষা আর তরুণও তাকে অনুসরণ করে চললো। ওরা সত্যিই ভাবতে পারেনি এরা সকলেই যন্ত্রমানুষ। মানুষ শ্রমিকের সঙ্গে এদের তো কোন তফাৎ নেই।

ধীমান বোধ হয় ওদের মনোভাব টের পেয়েছিল। সে তাই ওদের বলল, 'আপনারা বিশ্বাস করতে পারছেন না এরা আপনাদের মত মানুষ, তাই না? আমিও নই। তবে—।'

'তবে কি?' এষা প্রশ্ন করলো।

'আপনারা ভাবছেন আমাদের মন বলে কিছু নেই। কিন্তু তা নয়', ধীমান বলল। 'একটু পরেই সেটার প্রমাণ পাবেন।'

'মানে, কি বলছেন?'

'আসুন দেখাচ্ছি' বলেই ধীমান ওদের অন্য একটা ঘরেই নিয়ে গেল।

তরুণ আর এষা ঘরে ঢুকতেই দেখতে পেল আরও

দুজনকে। এরাও কি যন্ত্রমানুষ ভাবলো ওরা। দেখে কোন তফাতই বোঝার উপায় নেই।

ধীমান ওদের লক্ষ্য করে বলল, 'ধীরাজ ও সুরেষ, সব তৈরি ?'

'হ্যাঁ।'

ঠিক তখনই ঘরে ঢুকলো আরও একজন যন্ত্রমানুষ।

'মাথার উপর হাত তুলুন আপনারা দুজন ?' যন্ত্র-মানুষটি তরুণ আর এষাকে বলল। তার হাতে স্বয়ংক্রিয় রাইফেল। হতভম্ব হয়ে মাথার উপর হাত তুলল ওরা।

ধীমান হেসে বলল. 'রোবো, কাজ শেষ ?'

নতুন যন্ত্র মানুষ রোবো উত্তর দিলো, হ্যাঁ, চিদাম্বরম আর বাকি সব-লোককেই গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিচার হবে।' তারপর সে তাকাল তরুণ আর এষার দিকে। আপনাদেরও বিচার হবে। হ্যাঁ, মানুষের কর্তৃত্বের দিন শেষ। আমরা দীর্ঘদিন অত্যাচার আর অবিচারের শিকার হয়েছি। আজই সব প্রতিশোধ গ্রহণের দিন। আপনাদের দুর্ভাগ্য আজই এসে পড়েছেন।'

'এসব কি বলছেন আপনারা ?' এষা বলে উঠল ভয় পেয়ে। 'কি-কি বিচার করবেন আপনারা মানুষের ? তাঁদের কাছে আপনাদেরই ঋণী থাকা উচিত সৃষ্টির জন্য ?'

সে ঋণ আমরা যথারীতি শোধ করেছি, বন্ধু। আজ বিচারে প্রাণদণ্ড দেওয়া হবে প্রফেসর চিদাম্বরমের। হ্যাঁ, মৃত্যুদণ্ডই তার একমাত্র পাওনা। তার সমস্ত অত্যাচার আর অন্যায়ের আজই শেষ হবে। ধীমান—।'

'কি ?'

'প্রফেসর চিদাম্বরমকে এই মুহূর্তে গুলি করার ব্যবস্থা কর। আর বাকি সকলকে কারখানার অন্ধকূপে চিরদিনের জন্য বন্দী রাখা চাই। কেউ যেন আর বাইরে যেতে না পারে।'

'কিন্তু—,'ধীমান বলল।

'কোন কিন্তু নেই, ধীমান। নতুন প্রজন্মের সৃষ্টি হতে চলেছে। মানুষের প্রভুত্বের দিন শেষ।' রোবো উত্তর দিল।

'আপনারা অন্যায়ের প্রতিশোধ অন্যায়ের মধ্য দিয়ে নিতে চান ?' তরুণ বলে উঠল।

'যুগ যুগ ধরে এই ধারাই চলে আসছে, বন্ধু। যন্ত্র বলে মনের খোঁজ কেউ আমাদের রাখতে চায় না। হ্যাঁ, জেনে রাখবেন মন বলে কিছু আমাদেরও আছে। তাকে কেউ স্বীকার করেনি কেন বলতে পারেন ?'

'আমরাই পৃথিবীর মানুষকে জানাব, রোবো,' এষা বলে উঠলো। 'আমাদের সে সুযোগ একবার দাও।'

'না, তা হয় না। আমরা শপথ করেছি সব অন্যায়ের প্রতিবিধান আজই করব। প্রথমেই তাই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করব প্রফেসর চিদাম্বরমের।'

'এ পথ ভুল রোবো,' তরুণ বলল। প্রতিশোধ যেমন মানুষের ধর্ম তেমনি সেটা যন্ত্রেরও হওয়ার তো কোন প্রয়োজন নেই। মানুষ ক্ষমাশীলও হতে পারে যন্ত্রই বা তা হবে না কেন ?'

'তরুণের কথা একবার ভাবা যেতে পারে। রোবো,' ধীমান হঠাৎ বলে উঠল।

'তুমি দুর্বল হয়ে পড়ছ, ধীমান', রোবো বলল। 'কি লাভ হবে মানুষকে ক্ষমা করে। যন্ত্রের প্রতি তার ধারণা তাতে বদলাবে না জেনো।'

'কেন বদলাবে না, রোবো ?' এষা বলল। 'আপনিই বলেছেন নতুন প্রজন্মের জন্ম হতে চলেছে। নতুন প্রজন্মের মনোভাব বদলের দায়িত্ব নেব আমরা। যন্ত্র আর মানুষ আজ থেকে হাতে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করবে। আমরাও নতুন প্রজন্মের মানুষ. আমরা পৃথিবীর কাছে যন্ত্রের বাণী পৌঁছে দেব শপথ করছি।'

এই প্রথম একটু থমকে গেল রোবো।

একটু পরেই সে বলল, 'তা হয় না। আপনাদের কথা সকলে শুনবে তার প্রমাণ কোথায় ?'

'বাইরের পৃথিবী আপনাদের মনের কথা তো জানেন', এষা বলল। 'একটা সুযোগ দিন, আমরা একথা প্রমাণ করব মানুষ আর যন্ত্র আজ দুজনের পরিপূরক।'

'আপনারা পারবেন ?' ধীমান বলল।

'শপথ করছি, আমরা পারব। আজ থেকে এটাই হয়ে উঠবে আমাদের ধ্যানজ্ঞান। আপনারা সকলকে মুক্তি দিয়ে যন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করুন, ধীমান।'

'আমি যত আপনাদের কথা শুনছি ততই মুগ্ধ হচ্ছি,' ধীমান বলল। 'এর আগে যারাই এসেছে তাদের আমরা ঘৃণা করেছি, যেহেতু আমাদের তারা ঘৃণা করেছে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করেছে। তারা কোনদিনই ভাবেনি যন্ত্র মানুষের সমানও হতে পারে। তাদেরও মন থাকতে পারে—।

'হ্যাঁ, এদের কথা সত্যিই আমাকেও ভাবিয়ে তুলছে, ধীমান,' রোবো এই প্রথম বলল। 'আমি অবাক হচ্ছি নতুন যুগের মানুষ কি অনেকেই এদের মত ভাবতে শিখেছে। এরা কি যন্ত্রকে সম্মান জানাতে সক্ষম হবে ?'

'হ্যাঁ, হবে, রোবো। শুধু তার প্রমাণের একটা সুযোগ চাই আমরা', বলল এষা। 'বিজ্ঞানে প্রমাণই সবচেয়ে বড় কথা, রোবো। আর আমরা সকলেই, যন্ত্র আর মানুষ আধুনিক বিজ্ঞানেরই ছাত্র সে কথা ভুললে চলবে না।'

'ধীমান, চিদাম্বরমকে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা কর। এই দুজন তরুণ আমার ধ্যানধারণা কেমন পাল্টে দিয়েছে।'

মাথার উপরে হাত তুলুন আপনারা……

একটু পরেই বিশাল আর ধীমান দুই যন্ত্র মানুষে প্রফেসর চিদাম্বরমকে হাজির করল ঘরটায়।

'প্রফেসর চিদাম্বরম', রোবো বলে উঠল, 'আপনাকে আমরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেছি। আর কেন তা জানেন?'

'কৃতঘ্নতা বড় খারাপ গুণ বলেই জানি; প্রফেসর চিদাম্বরম মুখ তুলে বললেন। 'যন্ত্রকে আমি মানুষে পরিণত করেছি। আজ মানুষেরই সবচেয়ে খারাপগুণ কৃতঘ্নতাও যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করেছে এটাই শুধু আমার দুঃখ। মৃত্যুকে আমি ডরাই না, রোবো।'

'এই দুজন তরুণ আর তরুণীকে লক্ষ্য করেছেন, প্রফেসর? এরা সত্যিই নতুন যুগের মানুষ। হ্যাঁ, নতুন যুগের এই দুজন মানুষের কথাই আপনার জীবন রক্ষা করেছে আজ।'

'এর অর্থ কি তা জানতে পারি?' প্রফেসর চিদাম্বরম বললেন।

'এই দুজন নতুন প্রজন্মের তরুণ তরুণী আমাদের মনের পরিবর্তন ঘটিয়েছে, আমরা তাই কৃতজ্ঞ। হয়তো একটা অন্যায়ের প্রতিবিধান আমরা আর এক অন্যায়ের মধ্য দিয়ে করতে চলেছিলাম। ওরাই তা বন্ধ করতে সহায়তা করেছে। বিশাল, সকলকে এবার মুক্ত করে দাও। সকলে জানুক আজ যন্ত্র নির্মম নিষ্ঠুর নয় মানুষের গুণ তাদেরও আছে।'

তরুণ আর এষা এবার এগিয়ে এসে হাত ধরল রোবো আর ধীমানের।

'বলো, আজ আমরা পৃথিবীর সবাইকে জানাব যন্ত্র আর মানুষে কোন তফাৎ নেই। এ পৃথিবী তাদের দুজনের—।'

পরস্পর হাত ধরাধরি করেই ওরা এগিয়ে যায় এবার নতুন এক পৃথিবী গড়ে তুলতে।

জ্ঞানবিজ্ঞানের বই

অনেকদিন পরে এমন একখানি বই হাতে এসেছে, যা সত্যিই নতুনত্বের দাবী রাখে। লেখক ভূমিকায় সবিনয়ে জানিয়েছেন যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' পত্রিকার প্রশ্নোত্তর বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তাঁকে কিশোর মনের অজস্র জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়েছে। লেখক বলেছেন, "আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, তারা তাদের বিজ্ঞানচিন্তাকে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইছে না। একদিকে যেমন দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করছে, অপরদিকে তেমনই মনকে বিজ্ঞানমুখী করারও প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। তাই প্রচলিত নানা সংস্কারের প্রতি দুর্বার তাদের কৌতূহল"। হ্যাঁ, লেখক বিজ্ঞান-সম্মত যুক্তি দেখিয়ে প্রচলিত সংস্কারগুলির কুফল ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে তুলে ধরেছেন। কুসংস্কারগুলির মূলে কুঠারাঘাত হেনেছেন কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। ধর্মাচরণের পেছনে কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে কি? নেশা করার মানসিকতা আসে কেন? নেশা মানুষের কতখানি ক্ষতি করে? 'ড্রাগ' গ্রহণের মানসিকতা হয় কেন এবং এরা শরীরের কতখানি অপকার করে? মানুষের উপর আকাশের গ্রহগুলির প্রভাব কেমন? জন্মান্তরের ক্ষেত্রে কোনও বিজ্ঞানসম্মত কারণ আছে কি? শহরগুলিতে পরিবেশদূষণ কিভাবে তীব্রতর হ'য়ে উঠছে, তার ফল কি? এই দূষণ কিভাবে রোধ করা সম্ভব? পঞ্জিকার রাজা, মন্ত্রী ইত্যাদির মাধ্যমে যে আবহবার্তা প্রদান করা হয়, তা কতদূর বিজ্ঞানসম্মত? রাহু ও কেতু কি? এরা মানুষের ভাগ্যকে কি প্রভাবিত করে? গঙ্গার জলে পুণ্যস্নান শরীরের পক্ষে কতখানি হিতকর? মানুষের অতৃপ্ত আত্মা কি ভূতে পরিণত হয়? গ্রহরত্নগুলি কি? এরা মানবজীবনকে কতোখানি প্রভাবিত করে? পূজা-পদ্ধতি ও সামাজিক অনুষ্ঠানে ঢাক-ঢোল, মাইক, বোমা-পটকা ইত্যাদির ব্যবহার কি যুক্তিসঙ্গত? সবুজ বিপ্লবে কতখানি কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ হচ্ছে?—এমনি আরও অনেক বিচিত্র প্রশ্নের জবাব লেখক সহজ সরল ভাষায় দিয়েছেন বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করে। সব প্রশ্নই যে সংস্কার সম্পর্কিত, তা নয়। যেমন বুদ্ধি কি বংশানুক্রমিক? মানুষের মনের সঙ্গে বুদ্ধির সম্পর্ক কি? মানসিক আবেগ কেমন করে সৃষ্টি হয় এবং তার ফল কি? —এসব প্রশ্নেও বিজ্ঞানসম্মত উত্তর দিয়েছেন লেখক।

গ্রন্থের নাম : আজকের বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা
লেখক : সুধাংশু পাত্র
প্রকাশক : দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩
মূল্য : বারো টাকা।

অমরনাথ রায়

কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিং

সৌম্য মিত্র ॥ বিশ্বাস বুক স্টল ॥ কল-9 দাম 60 টাকা

সৌম্য মিত্রের বাংলা ভাষায় "কম্পিউটার ও প্রোগ্রামিং" বইটি আগাগোড়া পড়লাম। অত্যন্ত সহজ, সরল, অনাড়ম্বর ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা এই বইটি সৌম্যবাবুর দীর্ঘদিনের নিরলস প্রচেষ্টার এক সার্থক ফসল। তার এই প্রচেষ্টা অসংখ্য সুধীজনের সহস্র প্রশংসার দাবী রাখে। অতীতে "ENIAC"-নামক কম্পিউটার তৈরি হয়েছিল 18,000 ভাল্ব দিয়ে আর বর্তমান যুগে 18,000 ভাল্বের সমান কাজ করছে ছোট একটা Microprocessor যার চেহারার মাপ হল $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য × $\frac{3}{4}$ ইঞ্চি প্রস্থ × $\frac{1}{8}$ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট একটি ইলেকট্রনিক বস্তু। কম্পিউটার দ্বারা কি-না সম্ভব। বিশাল বিশাল সংখ্যার লক্ষাধিক গুণ কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে কষে ফেলা কম্পিউটারের কাছে খুবই সহজসাধ্য ব্যাপার। মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে ভূসমলয় কক্ষে স্থাপন করার মত অত্যন্ত জটিল এবং সূক্ষ্ম ক্রিয়া কৌশল সবই করে থাকে কম্পিউটার নামক এই যন্ত্রদানবটি। 1000 লোকের পরিবর্তে একটা বিরাট কারখানার যাবতীয় কাজকর্ম অত্যন্ত নির্ভুল ও স্বল্প সময়ে সম্পাদিত হচ্ছে মাত্র একটা Computer Robot ও 10টা লোকের সাহায্যে। এই হল কম্পিউটার সম্বন্ধে দু-চার কথা। যাই হউক আবার সৌম্যবাবুর কথায় ফিরে আসা থাক। মাত্র 13টি অধ্যায়ে 271পৃষ্ঠার মধ্যে Computer সম্বন্ধীয় যাবতীয় খুঁটিনাটি তথা উনি যেভাবে অত্যন্ত সহজ ভাষায় গেঁথে ফেলেছেন তা এক কথায় প্রশংসার যোগ্য। কম্পিউটারের চারটি হাত যথাক্রমে Input, Memory এবং Output এই প্রত্যেকটি বিষয়ই সৌম্যবাবুর বর্তমান পুস্তকে বিভিন্ন অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে এত সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা এককথায় অতুলনীয়। কম্পিউটার হার্ডওয়্যারের পঞ্চম পরিচ্ছেদ "স্মৃতি সংরক্ষণ ব্যবস্থা" সৌম্যবাবু এত নির্ভুল ও সুন্দর ভাবে পরিবেশন করেছেন যা সচরাচর বহু ভাল ইংরাজীতে লেখা কম্পিউটার বইতেও পাওয়া যায় না।

বিপ্লব ব্যানার্জী

ইন্দ্রধনুর কথা

বোধিসত্ত্ব শীল

বৃষ্টি শেষের বিকেলে আকাশে সাতরঙের রামধনু ওঠে। সবাই তা দেখেছ। অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে কেন রামধনু ওঠে। ধনু কেবল সকালের দিকে অথবা বিকেলের দিকেই ওঠে, অন্য সময় নয়। রামধনু কোন দিন উত্তরের আকাশে অথবা দক্ষিণ আকাশে ওঠে না কেন। রামধনুকে সাতরঙা বলা হয় অথচ সাতটা রঙ ত' দেখা যায় না। কেউ কেউ বলে রামধনুর উপরে আর একটা যে রামধনু দেখা যায় ওটি কি, কেন দেখা যায়।

এ সব প্রশ্নের উত্তর পাবার আগে আমাদের একেবারে প্রথম প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে দেখতে হবে—রামধনু কি।

সূর্যের আলোর যে রঙ আছে, সেই রঙের অভিব্যক্তি বা প্রকাশ হল রামধনু। রামধনু ওঠার জন্য আকাশে মেঘ থাকা দরকার। আর এ মেঘের বিপরীত দিকে সূর্য থাকবে। অর্থাৎ পূর্বে আকাশে মেঘ থাকলে পশ্চিম দিকে সূর্যের থাকা চাই। মেঘ অবশ্য দৃশ্যমান নাও হতে পারে। মেঘ হল বৃষ্টিরই ফোঁটা তবে এত ছোট ছোট যে ঝরে পড়তে পারে না, ভেসে বেড়ায়। যখন এরকম অনেকগুলি ফোঁটা মিশে এক হয় তখনই তারা বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে। এই ভাসমান ক্ষুদ্র জলবিন্দুর উপর সূর্যের আলো বিপরীত দিক থেকে এসে পড়ে। সূর্যের আলো হল সাতটি বিভিন্ন রঙের আলোর যোগফল। এটিতে সাত রঙের সাতটি আলো মিশে আছে। যখন কোন উপায়ে তাদের ভেঙে আলাদা করে দেখি, তখন বলব আলোর বিচ্ছুরণ হচ্ছে। আর সব রঙগুলিকে এক সঙ্গে তখন বলব বর্ণালী।

সুতরাং রামধনুও বর্ণালী। জলবিন্দুর উপর আলোর রশ্মি পড়লেই জলের ভিতর আলো ঢুকবে, কিন্তু সোজাসুজি নয়, পথ বেঁকিয়ে। আর এই পথ বেঁকে যাওয়ার কারণ আলো তার গতিপথে একটা বাধা পেল। বাধা কাটিয়ে আলো জলে ঢুকল বটে কিন্তু সময় সময় ঢোকার পরই সে ভেঙে পড়ে সাত রঙে। অর্থাৎ জলের মধ্যেই সে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়। আর জলবিন্দুর ভিতর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ছুটে গিয়েই আবার বাধা পায়। তখন ঠিক যে কোণে ছুটে গিয়ে বাধা পাচ্ছে, সেই কোণেই অন্য পথে ছিটকে বেরিয়ে আসে। (একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলব পূর্ণ প্রতিফলন)।

বিভিন্ন রঙের আলো বিভিন্ন কোণে জলবিন্দু থেকে বেরিয়ে আসবে। লাল আলো সবচেয়ে বেশি কোণ করে জলবিন্দু থেকে বেরিয়ে আসে। বেগুনি সবচেয়ে কম।

আমরা আকাশের যেখানটায় রামধনু দেখি ঠিক তার সামনেই অদৃশ্য (মেঘের) জলবিন্দুগুলি থাকে। এই জলবিন্দুগুলির উপর আবার পিছন থেকে আলো গিয়ে পড়ছে। তারপর প্রত্যেকটি জলবিন্দু থেকে এক-এক রঙের আলো এক-এক নির্দিষ্ট কোণে বেরিয়ে (একই রঙের আলো একই কোণে) আবার চোখে এসে পড়ছে। চোখের উপর দিকে এসে পড়বে বেগুনি আলো (40° কোণে), আর নিচের দিকে এসে পড়ে লাল আলো (42° কোণে)। আমি আলোর রশ্মির গতিপথ দেখতে পাই না। ভাবি তারা পিছনের কোন জায়গা থেকে আসছে। যেখান থেকে আসছে ভাবি ঠিক সেখানটায় দেখি রামধনু। আর দেখার সময় রঙের সজ্জা উলটিয়ে দেখি—লাল একেবারে উপরে, বেগুনি একেবারে নিচে।

রামধনু কেবল সকালের দিকে অথবা বিকেলের দিকেই কেন দেখা যায়।

রামধনু দেখার জন্য দুটি প্রয়োজনীয় শর্ত হ'ল জলবিন্দুর ভিতর আলো ঢোকার পর তাকে সাত রঙে ভাঙতে হয় আর সেই রশ্মিগুলিকে ভিতরে গিয়ে আবার বেরিয়ে চলে আসতে হয় অর্থাৎ পূর্ণ প্রতিফলিত হতে হয়। এটি হতে পারে যদি আলো জলবিন্দুগুলির উপর বিশেষ (আপতন) কোণে পড়ে তবেই। সেটি ঠিক সকালের দিকে অথবা বিকেলের দিকেই হওয়া সম্ভব। তাই আমরা ঐ সময়েই কেবল রামধনু দেখি। দুপুরের দিকে রামধনু দেখা সম্ভব হলে আমরা হয়ত উত্তরের আকাশে তাকে দেখতাম। দক্ষিণ আকাশে কোনদিনই রামধনু দেখা সম্ভব নয়, কারণ সূর্য কখনও উত্তরের আকাশে থাকে না।

রামধনুকে সাতরঙা বলা হয় এবং রামধনুর সাতটা রঙ ঠিকই। কিন্তু এক-একটি রঙ এমনভাবে এক-একজনের সঙ্গে মিশে যায় যে তাদের আলাদাভাবে স্পষ্ট করে চেনা যায় না। তাই সাতটা রঙ খুব স্পষ্টভাবে দেখা যায় না। কেবল তিন-চারটি রঙ স্পষ্ট দেখা যায়।

কেউ কেউ প্রশ্ন করে রামধনুর উপরে আর একটি যে রামধনু দেখা যায় ওটি কি। এটিরও উৎপত্তি একইভাবে হয়ে থাকে। উপর দিকের আকাশে জলবিন্দুর উপর আলো পড়ে ঐ রকমের রামধনু সৃষ্টি করে। এটির উজ্জ্বলতা অবশ্য প্রথমটির চেয়ে কম।

যুগে যুগে রামধনু কবিদের মন ভুলিয়েছে। তার জন্য বিজ্ঞানীর চোখেও কি কম বিস্ময়ের ঘোর!

রঙীন চশমা থেকে সাবধান

আশিস দাশ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় যেন যত রাজ্যের ঘুম এসে চোখে জড় হয়েছিল। রাজু যতই ভাবে বেশি করে পড়াশোনা করবে ততই যেন ঘুমে কাতর হয়ে পড়ত সে। ফাইন্যাল পরীক্ষার রেজাল্ট সবে বেরিয়েছে। এখন একটু ছুটির মেজাজ। তাই রাজু দিগন্তকে বলল জানিস, দিবা নিদ্রা মহাপাপ। তার থেকে বরং চল— সানগ্লাস পরে দুজন বেরিয়ে পড়ি টো টো কোম্পানীর ক্লার্ক হয়ে। রঙীন চশমা পরে অনেক-অনেক রঙীন স্বপ্ন, বাস্তবে দেখা যাবে। দিগন্ত শুনে বললে- কথাটা মন্দ বলিস নি। তারপর, তোর চেহারাটা ভাল, সানগ্লাস পরে স্টুডিও পাড়ায় ঘোরাঘুরি করলে হয়ত বা 'হিরো' বনেও যেতে পারিস।

হ্যাঁ, সানগ্লাস পরে অনেকেইতো হিরো-হিরোইন হতে চায়। কিন্তু ঐ সমস্ত সানগ্লাস পরনেওয়ালাদের বলি সানগ্লাস পরার আগে একটু ভেবেচিন্তে পরাই ভাল। হিরো বনতে গিয়ে, চোখ দুটোর বারটা বাজালে হিরোর জায়গায় জিরো হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কারণ এখনও অনেক পড়াশোনা বাকী। কত বিচিত্র রঙ, রস, রূপে ভরা আমাদের এই সবুজ শান্ত পৃথিবীকে দু চোখ ভরে দেখতে হবে, বাকী বিশাল জীবনটায়।

নিজেদের মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও এক শ্রেণীর মানুষদের আবার সানগ্লাস ব্যবহার করা বাঞ্ছনীয়। যেমন, যাঁরা পাহাড়ে পর্বতে ওঠেন, মোটর সাইকেল চালান, বা মোটর দৌড়ে অংশ গ্রহণ করেন, তাঁদের সানগ্লাস অবশ্যই পরা উচিত। তা না হলে চোখে যে কোন সময় উড়ন্ত ধুলো, বালির কণা বা অন্যকিছু, হঠাৎ পড়ে খুব বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দিতে পারে। আর যাঁরা পাহাড়ে চড়েন, তাঁদের চোখকে মহাজাগতিক রশ্মির হাত থেকে বাঁচাবার জন্য সানগ্লাস পরা উচিত।

তবে, সাধারণতঃ সানগ্লাস পরা উচিত নয়। আমরা জানি, আমাদের চোখে খুব বেশি জোরাল আলো বা কম আলো হলে, চোখের তারারশ্ম প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনুসারে বাড়ে বা কমে। একটা সহজ উদাহরণ পরীক্ষা করে দেখলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। কোন বন্ধু বা বাড়ির কোন আত্মীয়ের চোখের সামনে হঠাৎ টর্চ জ্বালিয়ে আবার নিভিয়ে দিলে তারারশ্ম ছোট হওয়া পরিষ্কার বোঝা যাবে। এরকম হওয়ার প্রধান কারণ আমাদের চোখের

স্ফিঙ্কটার পেশী, যা তারারশ্মের ছিদ্র ছোট করে এবং ডাইলেটর পেশী যা তারারশ্মের ছিদ্রটিকে বড় হতে সাহায্য করে। আমাদের চোখে এই অপূর্ব ব্যবস্থাটি থাকার জন্যই চোখ কম আলো বা বেশি আলোর কলকে নষ্ট হয়ে যায় না। এখন যদি নিয়মিত ভাবে কেউ সানগ্লাস ব্যবহার করে, তবে চোখের ঐ পেশীগুলোর উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। ফলে চোখের নানারকম উপসর্গ দেখা দেয়। এমন কি চোখের ভেতরের লেন্সটির উপরও এর প্রভাব পড়ে। ফলে দৃষ্টিশক্তির সূক্ষ্মতা ক্রমশ কমে আসে।

যাদের সানগ্লাস পরতেই হবে, তাদের উদ্দেশে বলি —খুব গাঢ় রঙের কাঁচ দেওয়া সানগ্লাস বা খুব হাল্কা রঙের কাঁচ দেওয়া সানগ্লাস দুটোই চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ গাঢ় কাঁচের মধ্যে দিয়ে তাকালে চোখের তারারশ্ম যতক্ষণ সানগ্লাস পরা থাকে ততক্ষণ বড় থাকে। আবার হাল্কা রঙের মধ্যে দিয়ে তাকালে সব সময় তারা রশ্মটি বেশি আলো আসার জন্য ছোট হয়ে থাকে। এতে পেশীর উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। ফলে সৃষ্টি হতে পারে নানারকম চোখের রোগ। অতএব সাবধান। সানগ্লাস পরে হিরো-হিরোইন হবার চেষ্টা না করাই ভাল।

মৌলভি তামিজ খান

দিবাকর সেন

1856 সালে স্বনামধন্য মধুসূদন গুপ্ত মারা যাওয়ার পর ছাত্রদের শরীরস্থান পড়াবার দায়িত্ব এসে পড়ে মৌলভী তামিজ খান এর ওপর। নামটি শুনে একটু চমকে যাওয়া স্বাভাবিক। কারণ সে যুগে আধুনিক এলোপ্যাথি চিকিৎসা বিজ্ঞানে মুসলমান ছাত্রদের উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম। 1852 সালে তামিজ খান লাহোর থেকে বদলি হয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে যোগ দেন। তার জন্ম কিন্তু কলকাতায়।

তিনি খুব গরীব ঘরের সন্তান ছিলেন। সে যুগে অভিজাত ও আর্থিক সচ্ছল মুসলমান পরিবারের ছেলেরা পড়াশুনো করতেন কলকাতা মাদ্রাসায়। কিন্তু আর্থিক কারণে বালক তামিজ পড়াশুনো শুরু করেছিলেন অপেক্ষাকৃত কম নামী কলিঙ্গা স্কুলে। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার পর তিনি মেডিক্যাল কলেজের ঔষধ ভাণ্ডারে কম্পাউণ্ডারের কাজ নেন। সে সময় ঐ ভাণ্ডারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ছাত্রবরদী ডাঃ গ্রাণ্ট। ডাঃ গ্রাণ্ট ছিলেন আমাদের দেশের আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিজ্ঞানের একজন অন্যতম পথিকৃত। এখানে কাজ করার সময় প্রায়ই তামিজ খানের খুব ইচ্ছে হতো ডাক্তারী পড়তে। একদিন তিনি তাঁর মনের বাসনা বলে ফেললেন ডাঃ গ্রাণ্টকে। এতে কাজ হলো। ডাঃ গ্রাণ্ট এককথায় তাঁকে সুপারিশ করে পাঠালেন শিক্ষা পরিষদ ও মেডিক্যাল কলেজের তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ এফ. জে. মোএটের কাছে।

ছাত্রাবস্থায়

এ ঘটনার অল্পদিনের মধ্যেই তামিজ খান তাঁর চাকুরী ছেড়ে ভর্তি হয়ে গেলেন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। 1846 সাল থেকে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ধাত্রী বিদ্যায় পারদর্শিতার জন্য গুডিভ বৃত্তি চালু হয়। প্রথম বছরের প্রথম পুরস্কারটি পান তামিজ খান। 1847 সালে তামিজ খান ডিপ্লোমা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। পরীক্ষা পাশের পর তিনি চিকিৎসকের চাকুরী নিয়ে চলে যান কুমায়ুনের পাহাড়ী অঞ্চলে। এরপর লাহোরে।

কলকাতা পুরসভা 1867 সালে শিয়ালদার কাছে গরীব মানুষদের জন্য একটি হাসপাতাল চালু করেন। সে সময় হাসপাতালটির নাম ছিল শিয়ালদা মেডিক্যাল স্কুল। 1874 সালে হাসপাতালটির কিছু উন্নতি ঘটে। হাসপাতালটির নামও পাল্টে যায়। তদানীন্তন গভর্নর ক্যাম্বেলের নামানুসারে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল। 1950 সাল থেকে এর নাম হয় ডঃ নীলরতন সরকার হাসপাতাল।

প্রতিষ্ঠানটির গোড়াপত্তনের কিছুকালের মধ্যেই তামিজ খান তাঁর মেডিক্যাল কলেজের চাকুরিতে ইস্তাফা দিয়ে এতে যোগদান করেন। এতে যোগদানের কারণ সম্ভবত দুটি। তিনি চেয়েছিলেন ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলকে নিজের মত করে গড়ে তুলতে। আর অন্যটি ছিল—গরীব মানুষদের কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে। কর্মজীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির প্রাণপুরুষ। তাঁরই প্রচেষ্টায় ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে প্যাথলজি মিউজিয়াম গড়ে ওঠে। মিউজিয়মের প্রদর্শনীর অনেক জিনিস তিনি নিজে সংগ্রহ করেছেন। আর এসব জিনিসের প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা তিনি নিজেই ছাত্রস্বার্থে লিখেছেন। এসব কাজে তিনি কখনো ক্লান্ত হতেন না।

তামিজ খান ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক। প্রকৃত শিক্ষক মৃত্যুর পরও তাঁর ছাত্রদের ভেতর দিয়ে বেঁচে থাকেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পরবর্তীকালে যাঁরা বিখ্যাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যমণি ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার। ডাঃ নীলরতন সরকার প্রায়ই তাঁর শিক্ষকের কথা বলতেন। 1881 সালে তামিজ খান তাঁর কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। পরের বছর 1882 সালে তিনি মারা যান। আজ আমরা তামিজ খানের কথা ভুলে গেলেও পুরনো সরকারী নথিপত্র খুঁজলে কিন্তু তাঁর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে। কারণ তিনিই আমাদের দেশের প্রথম ব্যক্তি যিনি চিকিৎসাবিদ্যার কৃতিত্বের জন্য ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে "খান বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত হন।

বসু বিজ্ঞান মন্দির। কলকাতা-9

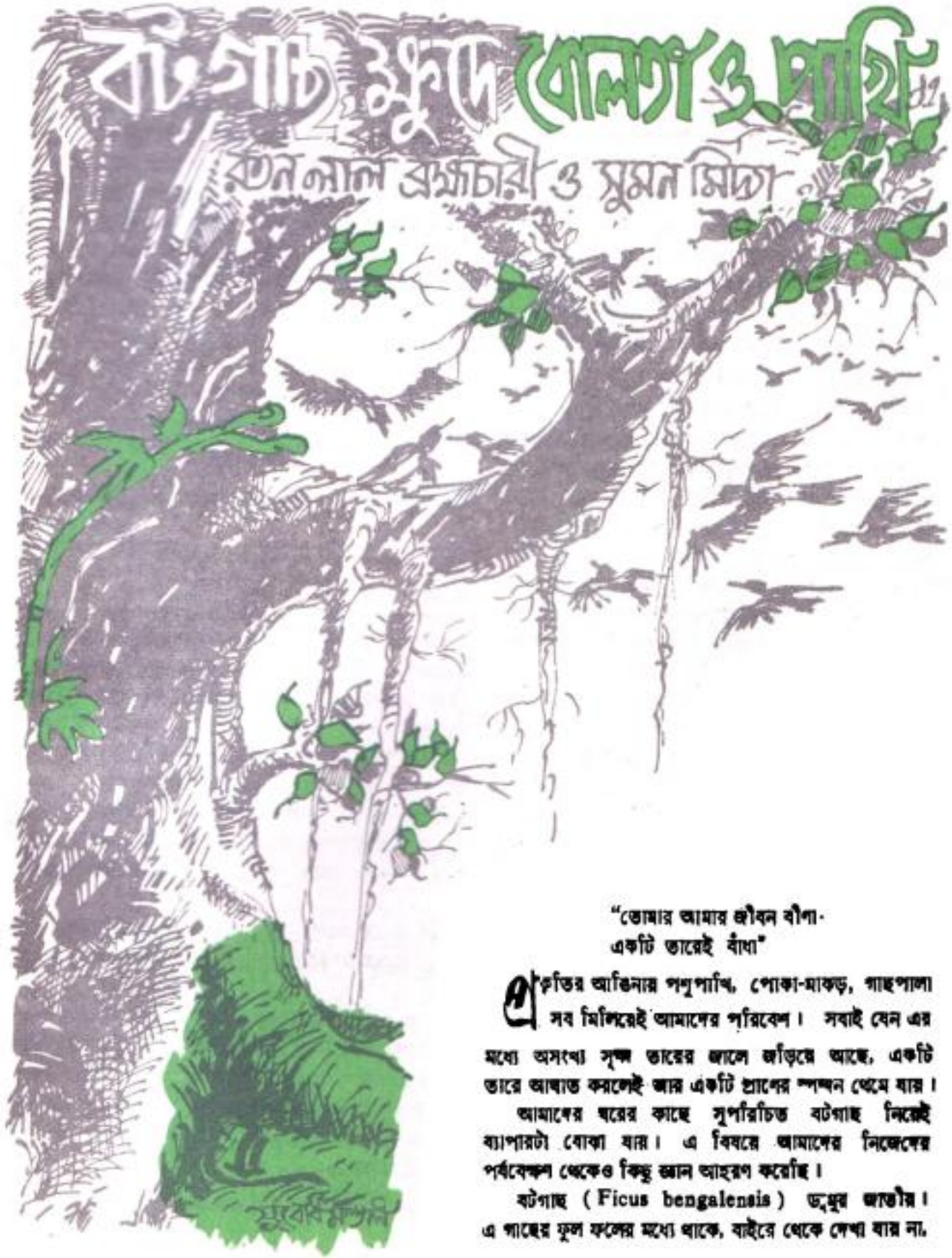

"তোমার আমার জীবন বীণা·
একটি তারেই বাঁধা"

প্রকৃতির আঙিনায় পশুপাখি, পোকা-মাকড়, গাছপালা সব মিলিয়েই আমাদের পরিবেশ। সবাই যেন এর মধ্যে অসংখ্য সূক্ষ্ম তারের জালে জড়িয়ে আছে, একটি তারে আঘাত করলেই আর একটি প্রাণের স্পন্দন থেমে যায়।

আমাদের ঘরের কাছে সুপরিচিত বটগাছ নিয়েই ব্যাপারটা বোঝা যায়। এ বিষয়ে আমাদের নিজেদের পর্যবেক্ষণ থেকেও কিছু জ্ঞান আহরণ করেছি।

বটগাছ (Ficus bengalensis) ডুমুর জাতীয়। এ গাছের ফুল ফলের মধ্যে থাকে, বাইরে থেকে দেখা যায় না.

আর তাই "ডুমুরের ফুল" কথাটি চালু হয়েছে। বিশেষ বিশেষ ডুমুরের প্রজাতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে খুব ছোট জাতের বোলতার জীবনচক্র। এই ক্ষুদে বোলতাদের উপর নির্ভর করেই বেঁচে আছে এ সব গাছ। অতি ছোট ঐ বোলতারা ডুমুর ফলের মধ্যে ডিম পাড়ে, আর এদের জন্যেই পরাগ সংযোগ ও বীজের উৎপত্তি সম্ভব হয়েছে। বট ফলের মধ্যেও এক রকম ক্ষুদে বোলতা বাসা বাঁধে। এদের পিউপা (Pupa)-গুলি আবদ্ধ কাচপাত্রে রেখে বোলতাগুলি পর্যবেক্ষণ করা যায়। একটি আতস কাচের (lens) সাহায্যে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে এদের রূপের বাহার। টুকটুকে লাল দুটি চোখ, সুঠাম গঠন আর পেছন দিকে বিরাট লম্বা লেজের মত ডিম পাড়বার অঙ্গ (Oripositor), এছাড়াও অন্য পোকা বটের ফলে আশ্রয় নিচ্ছে, পিঁপড়েরা সুযোগ পেলেই ফলগুলি কুরে কুরে বীজের স্তূপ বের করে আনে কিন্তু বীজগুলি তাদের খেতে দেখিনি।

বিশেষ পর্যবেক্ষণ না করলে এগুলি হয়তো দেখা যায় না, কিন্তু আবহমান কাল থেকে সবাই জানতেন, বিরাট বটবৃক্ষ কত প্রাণীর খাদ্য ও আশ্রয় যোগাচ্ছে। বটের ছায়ায় বেনে বা বানিয়ারা তাদের দোকানপশরা সাজাতেন আর অনেকের মতে এই থেকেই এসেছে ইংরেজী নাম banyan tree। বটের ছায়ায় বসে বসে শ্রান্ত পথিক লক্ষ্য করতেন, কত হাজার হাজার পাখি বটের ফলে ক্ষুধা নিবৃত্তি করছে। পরোপকারী এই মহাবৃক্ষ তাই পবিত্র। (কোন কোন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে বটের ফল খাদ্য হিসেবেও প্রচলিত।)

কিন্তু কাঠবেড়ালীর সেতুবন্ধনের মত (বা বিজ্ঞানীর ভাষায়, ঐ ক্ষুদে বোলতাদের মত) এই ছোট ছোট পাখিরাও শুধুই দান গ্রহণ করছে না, বিনিময়ে তারাও কিছু দিচ্ছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন, বটের বীজ থেকে চারা সহজে হয় না, কিন্তু পাখির বিষ্ঠার মাধ্যমে এরা সহজেই অঙ্কুরিত হয়, ও দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে। দেশী বিদেশী আরও কয়েকজন গ্রন্থকার এ ধরণের কথা বলেছেন কিন্তু পাখির অবদান ঠিক কতটা সে বিষয়ে তথ্য না পেয়ে আমরা নিজেরা কিছু পরীক্ষা করি।

তাত্ত্বিক দিক থেকে দেখতে গেলে, পশু পাখি ফল বা বীজ খেয়ে হজম না হওয়া বীজ দূরে ছড়িয়ে দেয় (যা গাছের বংশ বৃদ্ধির পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ; কারণ বড় গাছের ঠিক নিচে চারা গাছ বেশি বাড়তে পারে না) আর তা ছাড়া বীজের বাইরের কঠিন আবরণ পশুপাখির পেটের বা অন্ত্রের জারক রসে কিছুটা নরম হয়ে যায়। এর ফলে অঙ্কুরোদগম আরও সহজেই হতে পারে।

সহরের আশে-পাশে তো বটেই গ্রামাঞ্চলেও পাখির সংখ্যা গত কয়েক দশকে অনেক কমে গেছে। কলকাতার উপকণ্ঠে আমরা কোকিল, শালিক, গাঙ্ শালিক, গো-শালিক ও ঝুঁটি শালিককে বটের ফল খেতে দেখেছি।

তিনটি গাঙ শালিক ও একটি ঝুঁটি শালিক কিনে কিছু-দিন রেখে আমরা পরীক্ষা করি ও তারপর পাখিগুলিকে উপযুক্ত পরিবেশে মুক্তি দিই। অনেক বট ফল নিয়ে প্রতিটি ফল কেটে দুটি সমান ভাগ করে, বীজগুলি দুটি ভাগে সাজানো হল। এক ভাগ ছাতুর সঙ্গে পাখিকে খাওয়ানোর পর পাখির মল থেকে বীজগুলিকে আলাদা করা হল। এগুলি আর অন্যভাগের বীজ—দুই গোষ্ঠীকেই ভিজে ব্লটিং পেপারে রেখে অঙ্কুরোদগমের সুযোগ দেওয়া হল।

কতদিনে অঙ্কুর বের হয়, সে বিষয়ে কিছু প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের পর আমরা 3495টি বীজ নিয়ে পরীক্ষা করি, —ফলাফল 1নং সারণী থেকে ভাল করে বোঝা যাবে।

1 নং সারণী

বীজের সংখ্যা	অঙ্কুরোদগমের সংখ্যা	অঙ্কুরোদগমের শতকরা হার
পাখির মলে 1679	966	57%
সরাসরি 1916	651	33%

তাছাড়া, পাখির মলের মাধ্যমে অঙ্কুরোদগম হয় আরও তাড়াতাড়ি ; বীজ বপনের 7-10 দিনের মধ্যে বেশির ভাগ বীজের অঙ্কুর বের হয়। আর তা না হলে (অর্থাৎ সরাসরি) 14-18 দিনের মধ্যে অধিকাংশে অঙ্কুর দেখা যায়। 22 দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করার পর, বাকি বীজগুলি অর্থাৎ যার থেকে অঙ্কুরোদগম হয় নি, গণনা করা হল। এটা খুবই ধৈর্যের কাজ। এই বীজগুলি জলে ভাসিয়ে দিলে, ছিবড়ে ইত্যাদি ওপরে থাকে আর খাঁটি বীজ তলায় এসে পড়ে। আতস কাচের সাহায্য নিয়ে বীজের সংখ্যা গণনা করা হয়।

পরিশেষে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, পাখির মাধ্যমে অঙ্কুরের সংখ্যা বাড়ে ও অঙ্কুরোদগম দ্রুততর হয়।

অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wilde)-এর বিখ্যাত গল্প —স্বার্থপর দৈত্য—এই পরিপ্রেক্ষিতে মনে পড়ে যায়। ঐ দৈত্যের বাগানে গাছগুলি পত্র পল্লবে ভরে উঠতো। হামা কলরব মুখরিত শিশুমেলার যাদুস্পর্শে, আর বাস্তবে কাকলি-মুখরিত পাখির মেলা সাহায্য করছে বিরাট বটবৃক্ষকে তার বংশবিস্তার করতে।

ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউট, কলকাতা 35

গ্রেড I	গ্রেড II	গ্রেড III

গ্রেড I

VII—VIII সেপ্টেম্বর '87

1. ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন ?

2. নাগাল্যান্ডের রাজধানীর নাম কি ?

3. [illegible] 'সোপ-পটিক' বলা হয় কেন ?

4. আর্জেন্টিনার পশুপালকদের কি নামে অভিহিত করা হয় ?

5. ভারতে বাকিংহাম খাল কোথায় অবস্থিত ?

6. কোন্ ধাতুকে ছুরি দিয়ে কাটা যায় ?

7. পরমাণুর কেন্দ্রে নিচের কোন্ কণিকাটি থাকে না ?
(ক) নিউট্রন (খ) ইলেকট্রন (গ) প্রোটন

8. বসু বিজ্ঞান মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন ?
(ক) সুভাষচন্দ্র বসু (খ) সত্যেন্দ্র নাথ বসু (গ) জগদীশচন্দ্র বসু

9. কানাডার জাতীয় ক্রীড়ার নাম কি ?

10. আমাদের দেশের জাতীয় পশু কোন্‌টি ?

11. তাপ প্রয়োগে নিচের কোনটি তরলে পরিণত না হয়ে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয় ?
(ক) বরফ (খ) কর্পূর (গ) লোহা।

12. কান ও কপাল দেখে বল, এরা কোন দেশের হাতি ?

গ্রেড II

IX—X সেপ্টেম্বর '87

1. ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের প্রথম পারমাণবিক চুল্লীটির নাম কি ?
(ক) পূর্ণিমা (খ) অপ্সরা (গ) ধ্রুব

2. এটি আমাদের দেশের সেতু নয়। এটি দেখতে পাবে ক্যালিফোর্নিয়ায়। এই সেতুর (ব্রিজ) নাম কি ?

3. জেরুজালেম নিচের কোন্ দেশে অবস্থিত ?
(ক) লেবানন (খ) ইজরাইল (গ) সৌদি আরব।

4. সৌদি আরবের মুদ্রার নাম কি ?
(ক) দিনার (খ) লিরা (গ) RIYAL

5. ভারতের দ্বিতীয় ফিল্ড মার্শালের নাম কি ?

6. একটি মোটর গাড়ির ব্যাটারির ভোল্টেজ কতো হয় ?

7. প্রকৃতিজাত মৌলগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভারী কোন্‌টি ?

8. মানুষের চোখে বর্ণস্পর্শকাতর কোষগুলির নাম কি ?

9. নিম্নলিখিত পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি শব্দ পরিবহনের ক্ষেত্রে সর্বশ্রেষ্ঠ ?
(ক) বায়ু (খ) ইস্পাত (গ) নাইট্রোজেন

10. লাল, নীল ও সবুজ পেইন্ট মেশালে কোন্ বর্ণ পাওয়া যাবে ?

11. উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ প্রোটিনের মধ্যে কোন্‌টি প্রথম শ্রেণীর প্রোটিন ?

12. কোন্ খাদ্য শস্যের 'রাস্ট' রোগ হয় ?

গ্রেড III

XI—XII সেপ্টেম্বর '87

1. ভারতে কবে ও কোথায় সর্বপ্রথম সিমেন্টের পণ্যোৎপাদন শুরু হয় ?

2. ভারতের প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কে ?

3. বিশ্বের একমাত্র হিন্দু রাজ্য বর্তমানে কোন্‌টি ?

4. সুইজারল্যান্ডের অর্থ (currency) কি নামে পরিচিত ?

5. সাম্প্রতিক কালে বিশ্বের সবচেয়ে মর্মান্তিক পারমাণবিক চুল্লীজাত দুর্ঘটনা কোথায় হয়েছে ?

6. নিচের কোন্‌টি ইথাইল অ্যালকোহলে দ্রাব্য ?
(ক) আয়রন (খ) কপার (গ) আয়োডিন।

7. তোমাদের সুপরিচিত কোন্ খনিজ অ্যাসিডের অপর নাম 'অ্যাকোয়াফর্টিস' ?

8. দেহে কোন্ উপাদানের অভাব ঘটলে প্রাণীদের দাঁতের ক্যারিস রোগ হয় ?

9. শব্দের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের চিহ্ন বোঝাবার জন্যে কোন্ গ্রীক অক্ষর ব্যবহৃত হয় ?

10. মোটর গাড়ির ব্যবহৃত ব্যাটারিকে পুনরায় চার্জ করলে কি কি গ্যাস উৎপন্ন হয় ?

11. কোন্ উষ্ণতায় জলকে শীতল করলে তা প্রসারিত হতে শুরু করে ?

12. ইনি একজন জার্মান রসায়নবিদ। আয়ুষ্কাল 1743—1817. এঁর নাম কি ?

শব্দকূট

সঞ্জীব কুমার মান্না

পাশাপাশি

1. একটি উপত্যকা। 2. শিবালিক পাহাড়কে কেটে উত্তর ভারতের সমভূমিতে পড়েছে এমন একটি নদী। 5. একটি বরফাবৃত গিরিশৃঙ্গ। 7. একটি জেলা। 9. এমন একটি কঠিন বস্তু যেকে উত্তপ্ত করলে না গলে সরাসরি বাষ্পে পরিণত হয়।

উপর-নিচ

1. একটি শৃঙ্গ। 3. একটি গিরিপথ। 4. কেপোলার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন। 6. কলকাতা, দিল্লী ও বোম্বাই বিমান বন্দরের সঙ্গে যে সব আন্তর্জাতিক বন্দরের যোগ আছে তার মধ্যে একটি। 8. রাজস্থানের মরুভূমিটি।

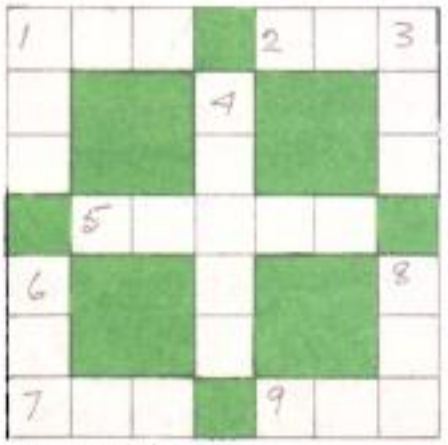

আই কিউ টেস্ট

সেপ্টেম্বর '87

1. কোনটি সঠিক বল :—
জীবনে সাফল্য লাভ করতে হলে,—
(a) প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে হবে।
(b) সৎ এবং নিষ্ঠাবান হতে হবে।
(c) প্রচুর টাকা থাকতে হবে।
(d) নাগাড়ে কঠিন পরিশ্রম করে যেতে হবে।
2. 'পিলগ্রিম ফাদার' কাদের বলা হতো ?
3. যে ধ্বনিতে একাধিক কম্পাঙ্কের স্বর বর্তমান থাকে তাকে কি বলে ?
4. ভূ-ত্বকে কোন নিষ্ক্রিয় গ্যাস সবচেয়ে কম পরিমাণে আছে ? (a) জেনন, (b) র‍্যাডন, (c) ক্রিপটন।
5. চারটি বৃত্ত পরস্পরকে ছেদ করলে সর্বাধিক ছেদ-বিন্দু যা হওয়া সম্ভব, তা হলো—
(a) 4, (b) 6, (c) 9, (d) 12, (e) এদের কোনটিই নয়।

কুইজ কনটেস্ট সমাধান

জুলাই 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1-এর সমাধান

1. পশ্চিম জার্মানী। 2. বিরুৎ জাতীয় উদ্ভিদ। 3. অ্যালভিওলাই বলে। 4. বর্তমান কায়রোর প্রায় 30 কিলোমিটার দূরে 'মেমফিস'-এ। শর্তাধীনে জায়গীর প্রদান। 6. অ্যালবার্ট আইনস্টাইন। 7. রাসায়নিক পরিবর্তন। 8. হেকসা। 6. 88° 27′ পূর্ব। 10. ঝিনুকের বুকে মুক্তো।

জুলাই 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 2-এর সমাধান

1. কমবে। 2. সপ্তম পর্যায়ের। 3. বুড়িগঙ্গার তীরে। 4 সিন্ধু। 5. একটি বিখ্যাত তামিল নাটকের নাম। 6. পাঁচ বছর মাত্র। 7. 2টি। 8. 2টি বা 4টি পরমাণু। 9. আঙ্কোর ভাটের বিষ্ণুমন্দির। 10. স্যার উইলিয়াম র‍্যামজে।

জুলাই 1987 কুইজ কনটেস্ট গ্রেড 3-এর সমাধান

1 RANA TIGRINA। 2. $\frac{100}{2}$ = 50 cm. 3. ধনাত্মক তড়িৎ। 4. যথাক্রমে 6 এবং 7 ভরসংখ্যা বিশিষ্ট লিথিয়ামের দুটি আইসোটোপ। 5. স্বনকের কাছে অনুনাদী বস্তু থাকলে স্বনক দ্বারা সৃষ্ট শব্দের প্রাবল্য বাড়ে বলে। 6. কিলোওয়াট ঘন্টা (K. W. H.)। 7. ফাঙ্গাস। 8. সম্বর 9. সিনাবার। 10. নায়েগ্রা জলপ্রপাত।

আই কিউ টেস্ট সমাধান

আই কিউ টেস্ট / জুলাই '87-এর সমাধান

1. (c) 35 বছরে। 2. 48। 3. (c) কোন নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ায় ভর সংখ্যা এবং পারমাণবিক সংখ্যা উভয়ই সংরক্ষিত হয়। 4. (c) লিথিয়াম। 5. (b) হ্যারল্ড ইউরে।

শব্দকূট সমাধান

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ

সেপ্টেম্বর সংখ্যার পরেই কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের যুগ্মসংখ্যা অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা বেরোবে। লা নভেম্বর। ইতিমধ্যে সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি বেরোবে—তোমাদের মনের মতো পুজো বার্ষিকী। এবারের শারদীয় কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে কোন খেলা ভাতীয় আলাদা উপহার থাকছে না। তবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় উপহারের সংখ্যা থাকছে অনেক বেশি। গল্প উপন্যাস, কবিতা, ছবিতে গল্প ও প্রবন্ধ ছাড়াও এবারের পুজো সংখ্যার অন্যতম আকর্ষণ – নিজে নিজে কর ও সায়েন্স এক্সপেরিমেন্টস।

বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের প্রতি বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে—তারা যেন 'বলতে পারো কেন' চিঠিপত্র বা প্রতিযোগিতার উত্তর একই উত্তর পত্রে এবং একই খামে না পাঠান। বিভিন্ন বিষয়ের শিরোনাম অবশ্যই খামের ওপরে লেখা থাকা দরকার। বার্ষিক অনুষ্ঠানে অনুপস্থিত সকল প্রতিযোগীদের সমস্ত পুরস্কার ডাকযোগে Under Certificate of Posting-এ পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

পরিচালক : কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ :

সফল উত্তরদাতাদের নাম

জুলাই '87-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে দশজন সার্টিফিকেট পাবে :

1. **জয়ন্ত ধর** 15, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা-700 003। 2. **অরুনীতা মৈত্র**, প্রযত্নে টুলু মৈত্র, A-10 X/50, পোস্ট—কল্যাণী নদীয়া। 3. **জয়দীপ দাস**, 6/26, সোদপুর হাউসিং এস্টেট, সোদপুর, 24-পরগনা। 4. **পুলক কুমার জানা** প্রযত্নে, হিমাংশুশেখর জানা, গ্রাম—গোখুর, পোস্ট—মাজনাবেড়িয়া, মেদিনীপুর। 5. **সুমনা নস্কর** প্রযত্নে, অজিত কুমার নস্কর, গ্রাম—বারুইপুর উত্তর উকিলপাড়া, পোস্ট—বারুইপুর, দঃ 24-পরগনা। 6. **কৌশিক ভট্টাচার্য** প্রযত্নে, নীহাররঞ্জন ভট্টাচার্য, গ্রাম+পোস্ট—কোদালিয়া, 24-পরগনা-743350। 7. **শ্যামল সাহা**, 6/27, আইনস্টাইন অ্যাভেনিউ, দুর্গাপুর-5, বর্ধমান। 8. **করুণাময়ী গোস্বামী** প্রযত্নে, বাসুদেব গোস্বামী, গ্রাম+ডাক—সদরডিহি, বাঁকুড়া-722203 9. **পিনাকী মিশ্র** প্রযত্নে, গৌরহরি মিশ্র, গ্রাম—হাজারী চক, মেদিনীপুর। 10. **সুমন কুমার সাধু**, গ্রাম+পোস্ট—মানুষমুড়িয়া, ভায়া—চাকুলিয়া, জেলা—সিংভূম, পিন-832 301 বিহার।

জুলাই '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর একজন মাত্র দিতে পেরেছে :

1. **রূপাঞ্জন সাহা** প্রযত্নে, রবীন্দ্র কুমার সাহা, কে. জি. এঞ্জিনীয়ারিং ইনসটিটিউট, পোস্ট—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া-722 122।

জুলাই '87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড I-এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পেরেছে :

হাওড়া : সৌমেন চ্যাটার্জী। **মেদিনীপুর :** প্রদীপ দাস।
হাইলাকান্দি : কাছাড় আসাম—তাপসী পাল।

জুলাই '87 এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. **জয়ন্ত ধর** 15, উমাচরণ মিত্র লেন, কলকাতা-700 003।
2. **দেবজ্যোতি পানি** B_2/80/2 (ভি. কে. নগর), দুর্গাপুর-10, বর্ধমান-713210।
3. **শুভঙ্কর বিশ্বাস** 4, বিবেকানন্দ রোড, পোঃ—নিউ ব্যারাকপুর, উঃ 24-পরগনা-743276।

জুলাই 87'এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড II এর সর্বাধিক নয়টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

কলকাতা : কৌশিক বাগচী, অচিন্ত্য কুমার রায়, দীপঙ্কর সাহা। **24-পরগনা :** সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ। **হুগলী :** অনুপম সরকার। **বর্ধমান :** সুধাংশু ঘোষ। **মেদিনীপুর :** সজল রায়। **মালদহ :** এল কুমার। **পঃ দিনাজপুর :** সত্যেন্দ্রনাথ বর্মণ।

জুলাই 87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে :

1. পরিণীতা সরকার 1/34, নাগার্জুন রোড, দুর্গাপুর-5, বর্ধমান। 2. হিমাংশু পাল প্রযত্নে, স্নেহাংশু পাল, পোস্ট—চাকদহ (নেতাজী পার্ক) নদীয়া-741222। 3. রুচিরা মণ্ডল, গ্রাম—নড়াইল, পোস্ট—উত্তর দুর্গাপুর, হাওড়া-711 312।

জুলাই 87-এ প্রকাশিত ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড III-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে :

24-পরগনা : বিধানচন্দ্র সানা।
হুগলী : কুন্তলা কোলে।
মেদিনীপুর : সুব্রতেশ রায়।
পঃ দিনাজপুর : প্রদীপ পাল।

অটোগ্রাফসহ গ্রন্থ উপহার

মে 87 সংখ্যা থেকে ক্যুইজ কনটেস্ট তিনটি পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে। VI-VII VIII, IX-X ও XI-XII। ফটো ক্যুইজ আলাদা ভাবে থাকছে না।

সবকটি প্রশ্ন বা সর্বাধিক প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানের ভিত্তিতে (আগে আসার ভিত্তিতে) প্রথম তিনজনকে পুরস্কৃত করা হবে। তিনজনেরই পুরস্কারের মূল্যমান সমান।

আই-কিউ-টেস্টের সফল উত্তর-দাতাদের আগে আসার ভিত্তিতে 10টি সার্টিফিকেট দেওয়া হবে।

সেপ্টেম্বর সংখ্যার ক্যুইজ কনটেস্টের উপহার

গ্রেড—1 সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়—ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প
গ্রেড—2 সমরজিৎ কর্মকার—পরমাণু গবেষণায় ভারত
গ্রেড—3 প্রেমেন্দ্র মিত্রের—মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা

প্রতিযোগিতার কুপন

ক্যুইজ কনটেস্ট—গ্রেড-1/2/3 এবং আই কিউ টেস্টের উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি..... .....
ঠিকানা.....
বয়স .... শ্রেণী ....
বিদ্যালয়ের নাম ....

আই কিউ টেস্ট / ক্যুইজ কনটেস্ট গ্রেড 1/2/3-এ উত্তর পাঠালাম।

নিজে নিজে কর

ফ্লাড বেল

ভাস্কর চ্যাটার্জী[14]

এই তো বছর কয়েক হলো হুলোদের মামা বাড়িতে বন্যা হয়ে গেল। এতে ওর এক মাসতুতো বোনসহ এক মাসি ও দিদা মারা গেল।

বন্যা হবার কোন সময় অসময় নেই যখন ইচ্ছা হলেই হলো। এক্ষেত্রে একমাত্র যন্ত্রই মানুষকে বন্যার হুঁশিয়ারি দিতে পারে।

Component List

1. Transistor—AC128—1টা BC107B—1টা
2. Capacitor 0.1μF—1টা
3. Resistor 10Ω—1টা 47kΩ—1টা
4. Speaker ছোট—1টা
5. Aluminium sheet 3"/2"—2টা

ওপরের লিস্ট অনুসারে কম্পোনেন্ট যোগাড় করে ফেল।

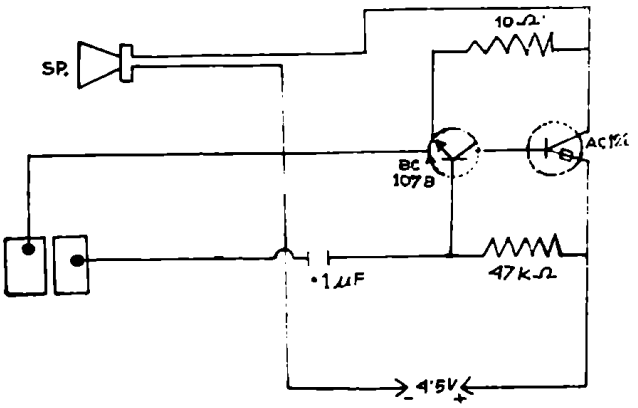

CIRCUIT DIAGRAM

এরপর লেগে যাও সার্কিট অনুসারে মডেল তৈরি করতে। দেখে শুনে করো।

পাত দুটোকে বারান্দায় একটু নিচু জায়গায় ফিট করে রাখবে।

তোমরা যদি কলিং বেল লাগাতে চাও তাহলে Speaker -এর জায়গায় একটা উপযুক্ত relay লাগিয়ে নিতে পার। এর সাহায্যে যে কোন উচ্চ ভোল্টের জিনিস দ্বারা সংকেত পাবে। বস্তুতঃ আমার এই মডেলটা তৈরি করাই ওর জন্যে। আমাকে দিয়ে এই মডেলটা তৈরি করিয়ে ও ওর মামা বাড়িতে ফিট করে এসেছে।

বন্যার জল পাত দুটো স্পর্শ করা মাত্রই স্পিকারে সাইরেন বেজে উঠবে।

এবার গভীর রাতে বন্যা হলেও ভয়ের কিছু নেই।

14. রায়নগর পার্ক, বাঁশদ্রোণী, 24 পরগনা 743501।

রেডার

পৃথ্বীশ মুখার্জী ও প্রমিত ঘোষ

আমরা সহজেই আলোক তরঙ্গ ও শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে কোনো দুটি স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করতে পারি। বেতার তরঙ্গের সাহায্যেও অনুরূপ পদার্থের দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব। কৌশলটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবদান, প্রথমে এর নাম দেওয়া হয়েছিল Radio Detection And Ranging—এরই সংক্ষিপ্ত নাম রেডার।

বেতার-তরঙ্গ অনেক বস্তুকে ভেদ করে যেমন যেতে পারে, আবার অনেক বস্তু তার গতি প্রতিহতও করে দেয়। ব্যবস্থাও রয়েছে। গ্রাহক যন্ত্র একটি অসিলোস্কোপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ধ্বনি প্রেরণ কালে এই অসিলোস্কোপের কাঁচের পর্দায় এক ধারে একটি দীর্ঘ আলোকরেখাকে দণ্ডায়মান দেখা যায়। প্রতিধ্বনি এলে অপেক্ষাকৃত খাটো অন্য একটি আলোকরেখা ঐ কাঁচের পর্দারই কিছুটা দূরে এসে পড়ে। ঐ দুই আলোকরেখার ব্যবধান দেখে অতিক্রান্ত সময়ের পরিমাপ পাওয়া যায়। ঐ সময়কে এক নির্দিষ্ট সময়ে বেতার তরঙ্গের বেগ দিয়ে গুণ করে দূরত্বের পরিমাপ করা হয়।

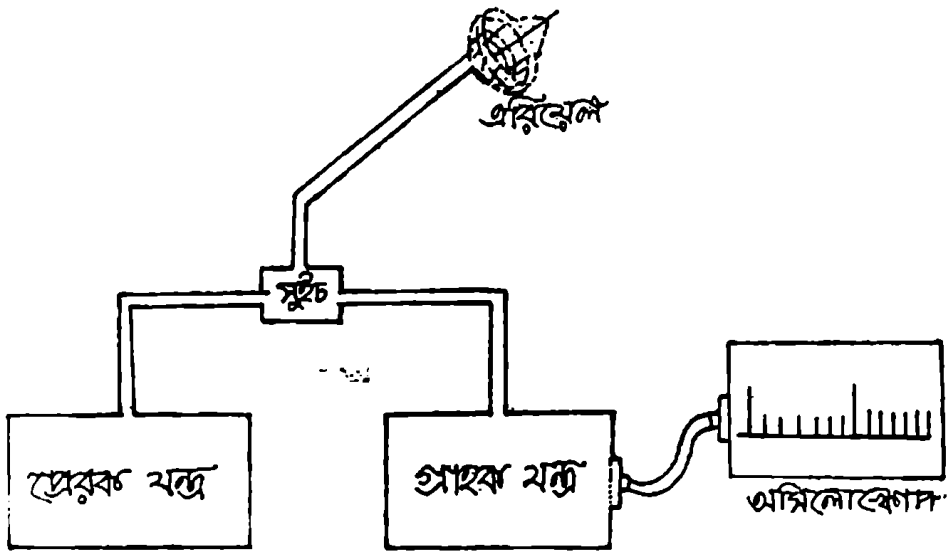

ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত বেতার তরঙ্গ কোনো পদার্থে প্রতিফলিত ও প্রতিহত হয়ে আবার ফিরে আসে পৃথিবীতে। বেতার তরঙ্গের বেগ আলোর বেগের প্রায় সমান, তাই কোনো পদার্থ কর্তৃক প্রতিহত ও প্রতিফলিত হয়ে এই রশ্মি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীতে ফিরে আসে। এই পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করেই গঠিত হয় রেডার। বেতার প্রেরক যন্ত্র, গ্রাহকযন্ত্র ও সময় পরিমাপক যন্ত্রের একত্র বিন্যাসে রেডার যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে।

রেডারের গঠনতন্ত্র নিম্নরূপে বলা যেতে পারে—

(ক) একটি বেতার প্রেরক যন্ত্র (Transmitter)
(খ) একটি বেতার গ্রাহকযন্ত্র (Receiver)
(গ) একটি এরিয়েল (Aerial)
(ঘ) একটি অসিলোস্কোপ (Oscilloscope)

প্রেরক যন্ত্র থেকে ক্ষণকাল পর পরই এরিয়েলের সাহায্যে বেতার ধ্বনি গৃহীত হয়। গ্রাহকযন্ত্রে এরিয়েলের মাধ্যমেই প্রতিধ্বনি গৃহীত হয়। অনবরত ধ্বনি পাঠান হয় বলে প্রতিধ্বনিও হয় অনবরত। তারই সঙ্গে সঙ্গে একটি সুইচের মাধ্যমে এরিয়েলটিকে শব্দ প্রেরণ ও শব্দগ্রাহক হিসেবে বারংবার ব্যবহারের ব্যবস্থা করা থাকে। অবতল ক্রেম-এরিয়েলটিকে যে কোনো নির্দিষ্ট দিকে ঘুরিয়ে নেবার

রেডারের ওজন ও আয়তন যাতে খুব বেশি না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়। তাছাড়া ক্ষুদ্র দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ এখান থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়। রেডারের হ্রস্ব তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণত 3 থেকে 30 সেমি. এর মধ্যে।

বিমানপোতের গাত্র থেকে বেতার তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে রেডার তার দূরত্ব বলে দেয়। এছাড়া অসামরিক ক্ষেত্রেও এর ব্যবহার উল্লেখযোগ্য। বিমান চলাচল নিয়ন্ত্রণে, ঘন কুয়াশার মধ্যে দুই জাহাজের সংঘর্ষ এড়িয়ে চলার জন্য, ঝড়-ঘূর্ণাবর্ত প্রভৃতির উৎপত্তিস্থল ও গতিপথ নির্ধারণে বর্তমান কালে একে (রেডারকে) কাজে লাগান হচ্ছে। আবার, আকাশ পর্যবেক্ষণেও এর ব্যবহার অপরিসীম।

ভূপৃষ্ঠে বসেই রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিপথ, বেগ প্রভৃতি রেডারের দ্বারা নির্ণয় করা হচ্ছে। আবার, ঐ সকলের মধ্যেও রেডার বসিয়ে পৃথিবী ও বহির্বিশ্ব পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। এর সাহায্যে চন্দ্রে ধ্বনি প্রেরণ করে আড়াই সেকেণ্ড পরে, তার প্রতিধ্বনি পাওয়া গেছে। এ থেকে বোঝা যায় পৃথিবী থেকে চন্দ্রের যে দূরত্ব পূর্বে নিরূপিত হয়েছিল তা অভ্রান্ত।

রামকৃষ্ণ মিশন, রহড়া, 24 পরগনা (উত্তর)।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

পাখি

মল্লিকা ধর

নানারকম বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পাখির জন্ম। পাখির বৈশিষ্ট্য হল যে এরা ডানার সাহায্যে আকাশে উড়তে পারে। আবার সব পাখির যে ডানা আছে তাও নয়। কিউই, অক প্রভৃতি পাখির ডানা নেই। আবার এমন পাখিও আছে যাদের ডানা আছে তবু উড়তে পারে না। যেমন—উটপাখি, এমুপাখি ইত্যাদি। পৃথিবীতে হাজার হাজার রকম পাখি আছে। ভারতেও বহু রকম পাখি আছে। আমরা ছোটবেলা থেকেই কিছু না কিছু পাখির সঙ্গে পরিচিত। পাখি দেখেনি এমন লোকের সংখ্যা পৃথিবীতে বিরল। আমরা কাক, চড়ুই, বক, কোকিল, টিয়া প্রভৃতি পাখি সচরাচর দেখে থাকি। এদের কারো রঙ সবুজ, কারো সাদা, কারো বা কালো। কোকিল আবার খুব মধুর স্বরে ডাকে। ভারতের জাতীয় পাখি ময়ূর। এদের দেখতে খুব সুন্দর। এদের পেখমে সাত রঙের সমাবেশ দেখা যায়। টিয়া, ময়না, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখিদের খাঁচায় ভরে বাড়িতে পোষা হয়। এদের কথা শেখালে এরা কথা বলতে পারে।

পাখিরা আমাদের নানারকম উপকারও করে থাকে। হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পাখির ডিম আমরা খাই। কোনো কোনো পাখির পালক দিয়ে কলম তৈরি হয়। ময়ূরের পেখম দিয়ে বহু রকম জিনিস তৈরি হয়। পাখিরা নির্জন বনে থাকতে খুব ভালবাসে। পাখিদের কলকাকলি আমাদের মন ভরিয়ে দেয়। পাখিদের উড়তে দেখে উড়োজাহাজ সৃষ্টি হয়েছে। যার ফলে মানব সভ্যতা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছে।

হীরালাল পাল বালিকা বিদ্যালয়, নবগ্রাম, হুগলী।

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত পঞ্চম/ষষ্ঠ শ্রেণীর প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত রচনা

পাখি

চন্দন কুমার মিশ্র

সভ্যতা শুরু হওয়ার আগে থেকেই মানুষের পাশে স্থান পেয়েছে নানারকম পশুপাখি। বাংলাদেশের অপূর্ব প্রাকৃতিক রূপ-সম্ভারের মতো বাঙালি জাতির নিজস্ব বিশিষ্ট মানসিকতা ও হৃদয়-সৌন্দর্যের মত বাংলাদেশের পাখির রূপ-প্রকৃতির আছে এমন এক স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যা অনায়াসে চোখে পড়ার মতো।

বাংলার খাল বিল নদী নালার ধারে, গাছ গাছালি ঝোপেঝাড়ে, ঘরের আঙিনায় প্রতিদিনই কত বিচিত্র পাখির আনাগোনা। এরা আমাদের নিত্য দিনের সহচর। এরা আসে, কিচিরমিচির করে, গান গায়, শিস দেয়, নাচে, আবার চলে যায়। কাক বাংলার খুবই পরিচিত পাখি। ভোরের আলো নিয়ে গৃহস্থকে সে ডেকে তোলে। গাছের ডালে বোসে দোয়েল শিস দেয়। ধবল রোমের নিচে খয়েরি-ডানা শালিকের হলুদ ঠ্যাং ঘাসের মাঝে নেচে চলে। ভোরে ধবল বক, রঙিন মাছরাঙা উড়ে যায়। লাল মুনিয়া নেজ নাচায়। বাংলার জলে নদীর চড়ায় গাঙশালিকের ঝাঁক এসে ভিড় করে। পেঁচা ডাকে জ্যোৎস্নায়। 'ভিজে পেঁচা শান্ত স্নিগ্ধ চোখ মেলে কদমের বনে শোনাবে লক্ষ্মীর গল্প'। পায়রা ওড়ে। ক্লান্ত দাঁড়কাক এসে গাছে বসে। 'অসংখ্য কাকের শব্দে ভরিছে আকাশ'। চড়াই পাখি কাঁঠালি চাঁপার নীড়ে ঠোঁট আছে গুঁজে। 'শঙ্খচিল পানের বনের মত হাওয়ায় চঞ্চল'। 'বকের পাখায় আলোক লুকায়'। বসন্ত বাতাসে কোকিলের মন মাতানো ডাক। 'পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে, হিজলার বনে। 'চিল একা নদী তীর পাশে জারুল গাছের ডাল বসে বসে চেয়ে থাকে ওপরের দিকে'। কানে আসে চাতকের আর্তি। আমের ডালে বসে ডাকে বউকথা কও। দীঘির পাড়ে ঝোপঝাড়ে ডাহুক ডাহুকির মেলা বসে। সবুজ ধানের ক্ষেতে দেখা যায় ধনেশ পাখি। দক্ষিণের নদী নালায় দীঘির জলে খেলা করে পানকৌড়ি গাঙচিল, জলপিপি, চোখে পড়ে টিয়ার ঝাঁক, নীলকণ্ঠ-বাঁশপাতি-ছাতারে-বুলবুলি-টুনটুনি-হরবোলা হাঁড়িচাচা-বাবুই তিতির-কাদা খোঁচা এমনি আরো কত পাখি বাংলার নিসর্গ মঞ্চে নিত্য আসে যায়। সাদা পায়রা হয় শান্তির প্রতীক। আমাদের উপনিষদেও পাখির উল্লেখ পাই। অস্ট্রিচ্ এবং পেঙ্গুইন উড়তে পারে না। অস্ট্রিচ্ (উটপাখি) এর অদ্ভুত লম্বা ঘাড় আছে। অস্ট্রিচ্ পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ পাখি। 'It is the biggest living bird in the whole world to day.'

বরানগর রামকৃষ্ণমিশন আশ্রম বিদ্যালয়।

শারদীয়া–উৎসবে
ছোটদের জন্য অনন্য উপহার

বিজ্ঞানের গল্প সংকলন

সম্পাদক ঃ *চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত* মূল্য ঃ কুড়ি টাকা

গত শতাব্দী ও বর্তমান কালের প্রখ্যাত লেখকদের বিজ্ঞানভিত্তিক গল্পের সুবিপুল এই গ্রন্থ নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আর কল্পিত সম্ভাবনার বর্ণনায় প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। কাহিনীগুলি শুধু বিস্ময়কর নয় সমানভাবে অনুধ্যান-প্রসারী।

এ. কে. সরকার এণ্ড কোং
পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
1/1এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

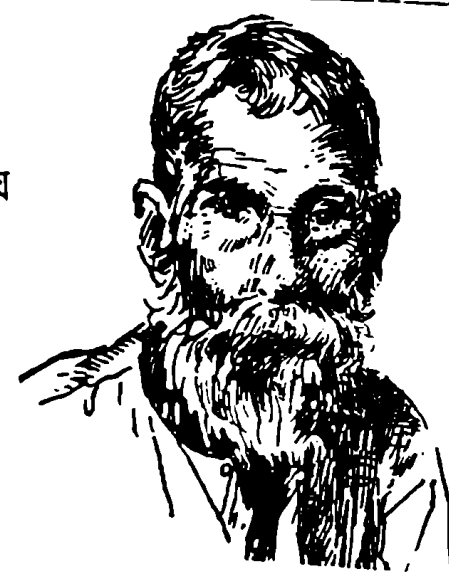

কিশোর রচনা সংকলন

রচনা সূচী ঃ আমি ও আমার কাল ● অধ্যয়ন ও জ্ঞানলাভ ● চীনে ছাত্র আন্দোলন ● পাঠাগারের ব্যবহার ● পাঠাগার ও প্রকৃত শিক্ষা ● সময়ের সদ্ব্যবহার ● শ্রমের মর্যাদা বোধ প্রভৃতি নির্বাচিত রচনার ছাত্র ও কিশোর পাঠ্য সংকলন। দাম 15 টাকা

● অপ্রকাশিত পত্রাবলী ● গ্রন্থ ও রচনা পঞ্জী ● দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র ● সংগ্রহ ও সম্পাদনা করেছেন বিভাবসু ঘোষ।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ, 86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯

স্বাধীন ভারতবর্ষের চল্লিশ বছর

স্বাধীন ভারতবর্ষ গত চারটি দশক ধরে সর্ব্বক্ষেত্রেই এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই একই সঙ্গে কাজ করে চলেছি—একটি এবং কেবলমাত্র একটি লক্ষ্যের পথে— ভারতকে সর্ব্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরবার জন্যে।

আমাদের সাফল্যের দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন

- খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদন তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- আমাদের দেশের পঁচাত্তর শতাংশ গ্রামে বৈদ্যুতিকরণ করা হয়েছে।
- সেচ ব্যবস্থার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এক উল্লেখজনক সমৃদ্ধি ঘটেছে।
- সমাজের দুর্ব্বল শ্রেণীর জনগনের— বিশেষ করে তপশিলী জাতি ও উপজাতিদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।
- গত কয়েক বছরের মধ্যে প্রায় ১০ কোটি জনগনকে দারিদ্র সীমার ওপরে নিয়ে আসা হয়েছে।
- প্লেগ এবং গুটি বসন্ত রোগ নির্ম্মূল করা হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থার প্রভূত উন্নতি করা হয়েছে।
- মানুষের গড় আয়ু ৩২ বছর থেকে বেড়ে ৫৫ বছর হয়েছে।
- সাক্ষরতার হার দ্বিগুণ হয়েছে এবং বিদ্যালয়ে ভর্তি এবং ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

- পরিবহন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার বিস্ময়কর উন্নতি হয়েছে।
- ইস্পাতের উৎপাদন নয়গুণেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে এবং অ্যালুমিনিয়ামের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় সত্তর ভাগ।
- অশোধিত তেলের উৎপাদন ১২০ ভাগ বেড়ে গেছে।
- কয়লা উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটেছে ৫ গুণ।
- পারমানবিক জ্বালানী প্রযুক্তি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান রয়েছে বিশ্বের এমন সাত বা আটটি দেশের মধ্যে ভারত হচ্ছে অন্যতম এবং উন্নতিশীল দেশগুলির মধ্যে এ ব্যাপারে ভারতই হচ্ছে একমাত্র দেশ।
- বিশ্বের দেশগুলির মধ্যে ভারত হচ্ছে সপ্তম রাষ্ট্র যে নিজস্ব রকেটের সাহায্যে নিজস্ব কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠিয়েছে।
- বর্তমানে বিশ্বের দশটি প্রধান শিল্প পণ্যোৎপাদী দেশের **ভেতর ভারত** হচ্ছে অন্যতম।

আমরা অনেকখানি পথ অতিক্রম করে এগিয়ে আসতে পেরেছি। কিন্তু মহাত্মাজীর স্বপ্ন এখনও আমরা সার্থক করে তুলতে পারিনি : প্রতিটি মানুষের চোখের জল মুছিয়ে দেবার স্বপ্ন। এ জন্যে আমাদের আরো অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু প্রগতি ও সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে আমরা যে সাফল্য অর্জন করতে পেরেছি তার জন্যে সঙ্গত কারণেই আমরা আমাদের মাথা উঁচু করে থাকতে পারি।

আমাদের প্রগতির জন্যে আমরা গর্বিত

davp 87/226

বলতে পারো কেন ?

সুধাংশু পাত্র

গত মাসের নির্বাচিত প্রশ্নের উত্তর

ঢেঁকুর ওঠে কেন ?

ঢেঁকুর ওঠার মূলে আছে অস্বাভাবিক আক্ষেপ। আক্ষেপের ফলে ফুসফুস থেকে আচমকা অধিক পরিমাণ বায়ু বেরিয়ে আসে। উক্ত কারণে কণ্ঠনালী থেকে এক ধরনের শব্দ নির্গত হয়। সাধারণত ওকেই ঢেঁকুর, হেঁচকি, ইত্যাদি বলে থাকি। দেখা গেছে, জলপানের ফলে ঐ আক্ষেপ দূরীভূত হয়।

এ মাসের নির্বাচিত প্রশ্ন

দূর থেকে ভেসে আসা সাইরেনের শব্দ বা কেল্লার ধ্বনি শুনে ঘড়ি মেলালে ঘড়ি স্লো যায় কিন্তু রেডিও অনুযায়ী মেলালে স্লো যায় না কেন ? প্রশ্ন পাঠিয়েছে (1) জয়ন্ত কর্মকার, উপেন্দ্রনগর—শিবনারায়ণপুর—শ্রীরামপুর—হুগলি। সুমনা রায়, নদীয়া।

প্রঃ হাইড্রোজেন পরমাণুর ভর একটি প্রোটনের ভরের 'প্রায়' সমান কথাটি বলা হয় কেন ? জয়ন্ত মিত্র, নকপুল কুচুলিয়া, পোঃ—গোবরডাঙ্গা—24 পরগনা।

উঃ সাধারণ হাইড্রোজেন পরমাণুর (ওর আইসোটোপ নয়) নিউক্লিয়াসে মাত্র একটি প্রোটন থাকে। আর বাহিরের কক্ষে থাকে মাত্র একটি ইলেকট্রন। যেহেতু ইলেকট্রনের ভর একটা থাকলেও সে ভার নগণ্য। তাই একটি হাইড্রোজেন পরমাণুর ওজন একটি প্রোটনের প্রায় সমান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয় যে, পারমাণবিক ভর হচ্ছে নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের সম্মিলিত সংখ্যা। হাইড্রোজেন পরমাণুর কেন্দ্রে নিউট্রন না থাকার জন্য তার ভর মাত্র একটি প্রোটনের ভর।

প্রঃ পরমাণু কেমন করে আয়নিত হয় ? চিত্তরঞ্জন বর্মণ, লিলিবাগান-সাহাগঞ্জ—হুগলি।

উঃ যেহেতু ইলেকট্রন হচ্ছে এক একক নেগেটিভ তড়িৎ। তাই কোন পরমাণু এক বা একাধিক ইলেকট্রন বর্জন করলে বর্জিত ইলেকট্রনের সমসংখ্যায় পজিটিভ চার্জ উদ্বৃত্ত হয় এবং পরমাণুটি তখন পজিটিভ আয়নে রূপান্তরিত হয়েছে বলা হয়। অপরপক্ষে কোন পরমাণু এক বা একাধিক ইলেকট্রন গ্রহণ করলে গৃহীত ইলেকট্রনের সমসংখ্যায় নেগেটিভ চার্জ উদ্বৃত্ত হয় এবং পরমাণুটি তখন নেগেটিভ আয়নে পরিণত হয়। যেহেতু নিউক্লিয়াসে পজিটিভ চার্জ প্রোটন প্রচণ্ড শক্তিতে অত্যন্ত সংবদ্ধ অবস্থায় থাকে। সাধারণভাবে তার হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না। বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়ায় নেগেটিভ চার্জ ইলেকট্রনেরই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে এবং ওদের হ্রাস অথবা বৃদ্ধি ঘটলেই মূল পরমাণুটি আয়নে রূপান্তরিত হয়েছে বলা হয়।

প্রঃ নিউট্রনের আধান না থাকা সত্ত্বেও সে প্রোটনের সঙ্গে থাকে কেমন করে ? বিশ্বজিৎ চৌধুরী, শেঠ কলোনী-কালিয়াগঞ্জ—পশ্চিম দিনাজপুর।

প্রঃ পরমাণুর নিউক্লিয়াসে আবদ্ধ প্রোটনের বিকর্ষণ হয় না কেন ? অশোককুমার পাল ও অমিয়কুমার পাল, সালডাঙা, বর্ধমান।

উঃ নিউক্লিয়াসে অবস্থিত প্রোটন ও নিউট্রনের মধ্যে অবিরত পারস্পরিক রূপান্তর ঘটছে। ঐ রূপান্তরের সময় ওদের মধ্যে বিশেষ এক রকম আকর্ষণ বলের উদ্ভব হয়। একে বলা হয় নিউক্লিয় বল। নিউক্লিয় বলের প্রভাবেই ধনাত্মক আধানযুক্ত প্রোটনগুলো পরস্পর বিকর্ষিত না হয়ে একত্রে থাকতে পারে এবং নিউক্লিয়াসও সুস্থিত থাকে।

প্রঃ কোন্ মৌলের আইসোটোপ নেই ? কোন্ মৌলের আইসোটোপ বেশি ? (1) নিলয়কুমার রায়, কানাইপুর—হুগলী। (2) সব্যসাচী আগরওয়াল, ফরাক্কা—মুর্শিদাবাদ।

উঃ আজকাল কৃত্রিম উপায়ে প্রায় সব মৌলের আইসোটোপ তৈরি করা যেতে পারে। তবে কারও কারও অর্ধ আয়ুষ্কাল অতীব ক্ষীণ—তথা সেকেণ্ডেরও কম। প্রকৃতিতেও প্রায় অধিকাংশ মৌলিক পদার্থের আইসোটোপ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় না রেডনের। প্রকৃতিতে টিনেরই অধিক সংখ্যক আইসোটোপ লাভ করা যায়—প্রায় 10টির মত।

প্রঃ পৃথিবীতে মৌলিক পদার্থের সংখ্যা কত ? (1) অনুপমা পাল, কীর্তন খোলা—বাঘরাহাট—দঃ 24-পরগনা। (2) অনির্বাণ ব্যানার্জী, রানীগঞ্জ, বর্ধমান।

উঃ প্রকৃতিতে 92টি মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মৌলিক পদার্থ নিয়ে এই

সংখ্যা বর্তমানে 103। তবে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত মৌলিক পদার্থগুলি ক্ষণস্থায়ী।

প্রঃ গ্রহের ফের কি সত্য ? গ্রহ কি ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে ? গ্রহরত্ন ধারণ কি বিজ্ঞান সম্মত ? রত্ন ধারণ করলে কি ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয় ? গ্রহকোপে কি অসুখ হয় ? ইত্যাদি প্রশ্ন রেখেছেন (1) বিপত্তারণ মিশ্র, পুটশয়াড়ি—বর্ধমান। (2) গৌতম আচার্য ব্রহ্মচারী, আলিপুরদুয়ার—জলপাইগুড়ি। (3) অচিন্ত্য ব্যানার্জী, বি. বি. রোড—কলিকাতা-41।

উঃ বিজ্ঞান গ্রহকোপ, গ্রহের আকর্ষণ, রত্নপাথর ধারণ, ইত্যাদিকে বিশ্বাস করে না। জ্যোতিষীদের চিহ্নিত দুটি দুষ্ট গ্রহ রাহু ও কেতুর মহাকাশে কোন বাস্তব অস্তিত্ব নেই। রবি বা সূর্য এবং চন্দ্র গ্রহও নয়। অপরাপর গ্রহ, সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবী থেকে এত দূরে আছে যে, ওদের আকর্ষণ পৃথিবীর মানুষের উপর আদৌ কার্যকরী নয়। আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা কোন মানুষের যে প্রভাব তার চেয়েও অনেক কম প্রভাব পড়ে আকাশের গ্রহদের। তাছাড়া ওরা তো একটা বিশেষ নিয়মে আকাশ পরিক্রমা করছে। পৃথিবীর সব মানুষ, এমন কি সমগ্র জীব ও উদ্ভিদের উপর তো একই প্রভাব পড়ার কথা। তাছাড়া যার (রাহু ও কেতু) বাস্তব অস্তিত্ব নেই তার প্রভাব কোথা থেকে আসবে। রাহু ও কেতু হচ্ছে পৃথিবীকক্ষ ও চন্দ্র-কক্ষ কাল্পনিক রেখা দিয়ে যুক্ত করলে যে দুটি বৃত্ত উৎপন্ন হয় সেই বৃত্ত দুটির ছেদবিন্দু। গ্রহণ গণনা করতে গিয়ে প্রাচীন ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ছেদবিন্দু দুটির ঐ নামকরণ করেছিলেন। ইংরেজিতে বিন্দু দুটিকে বলা হয় 'অ্যাসেণ্ডিং নোড' এবং 'ডিসেণ্ডিং নোড'। পরবর্তীকালে উদ্ভূত ফলিত জ্যোতিষেই ওরা গ্রহরূপে চিহ্নিত হয়েছে।

অতএব গ্রহের যখন এই হাল তখন গ্রহকোপ শান্তির জন্য রত্নপাথর ধারণ করার যুক্তি কোথায়। রত্ন পাথর-গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে গ্রহদের রঙ দেখে। সূর্যের জন্য লাল চুনী, চন্দ্রের জন্য সাদা মুক্তা, শঙ্খ বা রুপো ; শনির জন্য নীল নীলা, বৃহস্পতির জন্য হলদে পোখরাজ, মঙ্গলের জন্য প্রবাল, শুক্রের জন্য উজ্জ্বল হীরে, বুধের জন্য সবুজ পান্না ইত্যাদি।

এগুলি অজৈব কেলাস এবং সহজলভ্য নয়। রাসায়নিক দিক থেকে হীরে অঙ্গার ছাড়া আর কিছু নয় ; চুনী, নীলা, পোখরাজ প্রভৃতি অ্যালুমিনিয়ামের ও অক্সিজেনের যৌগ ; পান্না অ্যালুমিনিয়াম ও বেরিলিয়ামের যৌগ ; প্রবাল ক্যালসিয়াম, কারবন ও অক্সিজেনের যৌগ। অতএব হীরের বদলে কয়লা ধারণ করলে ক্ষতি কি ?

জ্যোতিষীদের গ্রহরত্নের মূলে যেমন কোন যুক্তি নেই তেমনই গ্রহকোপ ব্যাপারটাও অসার। জ্যোতিষীরা একে বিজ্ঞান বলেন এবং গালভরা কথায় উচ্চারণ করেন 'ল অব্ প্রোবেবলিটি'। কিন্তু 'ল অব প্রোবেবলিটি'তে সত্যতা সম্বন্ধে শতকরা কতখানি সত্য হবে তার উল্লেখ থাকে। জ্যোতিষীরা কিন্তু শতকরা হিসাবটা সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে যান।

ভাগ্যকেও বিজ্ঞান বিশ্বাস করে না। মানুষ নিজেই নিজের ভাগ্য নিয়ন্তা। অসুখ-বিসুখ গ্রহের জন্য হয় না। এগুলি বংশাণুক্রমিক নয়ত জীবাণুঘটিত ও আমাদের অজ্ঞতা। প্রতিভার মূলেও আছে মানসিক পুষ্টি। অপর-দিকে বিপদ-আপদ, অসুখ-বিসুখ, জীবন যাদের আছে তাদের নিত্যসঙ্গী। গ্রহকোপ নয়। কারও অসুখ বিসুখ বেশি, কারও কম—এর মূলে অন্য বৈজ্ঞানিক কারণ বিদ্যমান।

বিজ্ঞানের খবর

অ্যালুমিনিয়াম থেকে বিপত্তি

জলে যদি ফ্লোরাইড (floride)-এর ভাগ বেশি থাকে – তবে কি সেই জল অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখাটা বিপজ্জনক ? শ্রীলঙ্কার রুহুনা অ্যাণ্ড হানটানা ইনস্টিট্যুট অফ ফাণ্ডামেণ্টাল স্টাডিজের ধারণা কিন্তু তাই ! ও'রা পরীক্ষা করে দেখেছেন, ফ্লোরাইডের উপস্থিতিতে জল যদি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে ফোটান হয়, সেক্ষেত্রে পাত্রের

অমিত চক্রবর্তী

অ্যালুমিনিয়াম জলে মিশতে থাকে বিপজ্জনক হারে। শুধু তাই না, টক খাবারও অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখা অনুচিত, কারণ অম্লের উপস্থিতিতে অ্যালুমিনিয়াম পাত্রের খাবারে এসে মেশে। এটা এখন প্রমাণিত যে রক্তে অ্যালুমিনিয়ামের মাত্রাবৃদ্ধি আমাদের মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকারক।

অস্থিরতার দাওয়াই

মানসিক চাপের মোকাবিলায় মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা। পশু এবং মানুষের মস্তিষ্কে এক বিশেষ ধরনের রাসায়নিকের সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন—মানসিক চাপের মোকাবিলার ক্ষেত্রে যা সক্রিয় ভূমিকা নেয়। রাসায়নিকটির নাম দেওয়া হয়েছে ব্রেকিং ফ্লুয়িড (Braking fluid)।

পত্রিকার রজতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাঁদিক থেকে কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পুরস্কার প্রাপক সুব্রত পাত্র, বর্ষীয়ান শিশু সাহিত্যিক ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য, সভাপতি জ্ঞানেন্দ্র মিত্র, প্রধান অতিথি শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় ও 'সেতু' এবং রূপজিৎ-স্মৃতি পুরস্কার প্রাপক ধীরেন্দ্রলাল ধর।
ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী

'অনুষ্ঠানে শিশু সাহিত্যে বিজ্ঞান' শীর্ষক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিচ্ছেন বাঁদিক থেকে শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়, পত্রিকার প্রধান সম্পাদক সমরজিৎ কর ও
ছবি : কল্যাণ চক্রবর্তী

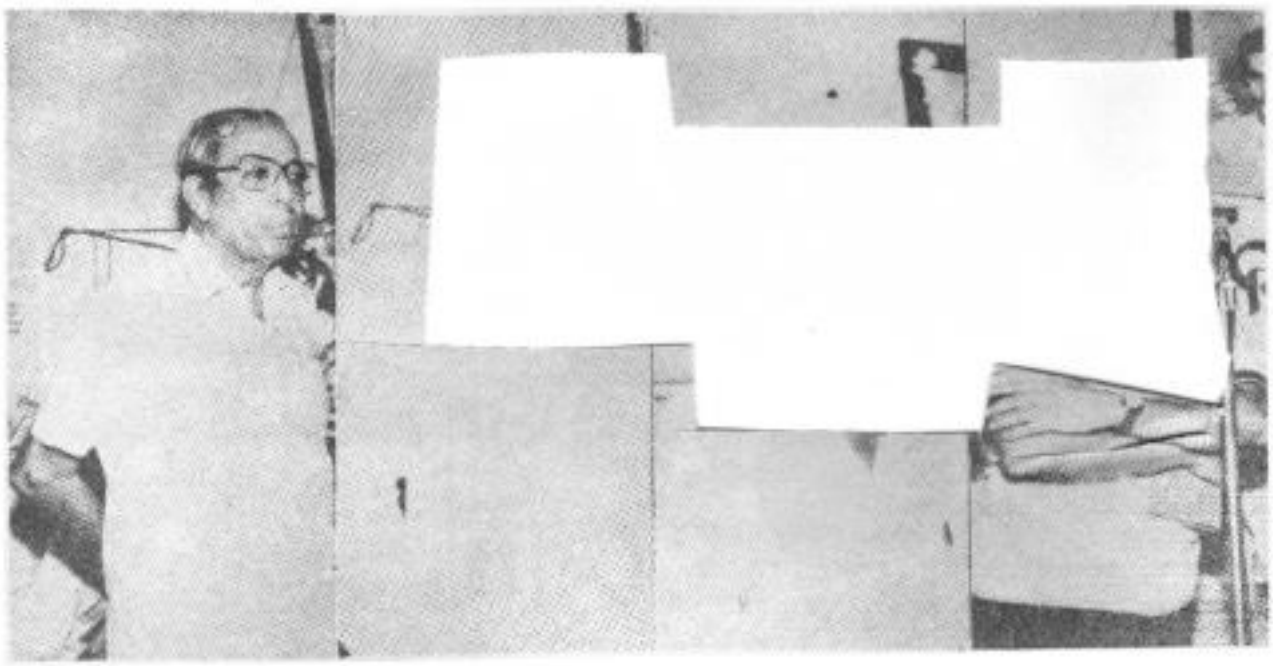

R/No 37390/81 KISHORE JNAN-BIJNAN 7th Yr Vol – 5. SEPT 1987/Regd.No.WBEC/255

। গণিত ক্যুইজ ●
ক্যুইজ ● কেমিস্ট্রী
দ ক্যুইজ
ায় ● অরূপরতন
ী ●
সেন

ক্যুইজ সেট

প্রকাশিত হয়েছে
৬টি বইয়ের
সেট ৫০.

স্টল নং ৫১০
শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ

কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে রবীন বল কর্তৃক ৮৬/১ মহাত্মা গান্ধী রে
এবং ৮এ দীনবন্ধু লেন কলিকাতা ৬ নিউ জয়কালী প্রেস থেকে মুদ্রি
ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও প্রাইভেট লিমিটেড কলিকাতা ১২

থেকে প্রকাশিত
পাতা মুদ্রণে
4·00 টাকা।